লং মার্চের কাহিনী

লং মার্চের কাহিনী

লং মার্চের কাহিনী

প্রগতি প্রকাশনী
কলিকাতা

STORIES OF LONG MARCH

LONG MARCHER KAHINI

লং মার্চের কাহিনী

অনুবাদ : বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

প্রথম প্রকাশ : ১লা অক্টোবর, ১৯৫৪

প্রকাশক :
অজিতকুমার বিশ্বাস
প্রগতি প্রকাশনী
৯৪, এইচ, কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা-১৯

প্রচ্ছদ : ভক্তি বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীনির্মল গুহ
বেঙ্গল অব প্রেস
১/৫/১এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : নয় টাকা।

প্রকাশকের নিবেদন

চীনবিপ্লবের বিজয়ের পঁচিশ বছরে পদার্পণের মুহূর্তে চীনের বিজয়ী জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের একটি গৌরবময়, অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে "লং মার্চের কাহিনী" অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, চীনের শ্রমজীবী জনগণের বিস্ময়কর বীরত্বের সেই অমর মহাকাব্যের কাহিনীগুলোর এই প্রকাশনা ব্যাপক সমাদর লাভ করবে।

অধ্যাপক বিজন বিহারী পুরকায়স্থ "লং মার্চের কাহিনী" বাংলায় তরজমা করে এবং তথ্যনিষ্ঠ প্রসঙ্গ-পরিচিতি লিখে দিয়ে পুস্তকখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। বহু বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবাইকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"লং মার্চের কাহিনী"র প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী বন্ধু শ্রীভক্তি বসু ; তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বব্যাপ্ত সংকট ও দুর্মূল্যের দিনে বইখানি প্রকাশ করতে হলো। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রয়মূল্য এর চেয়ে কম করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত। তবু সান্ত্বনা এই বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে কোনো অর্থব্যয়ে ও শ্রমবিনিয়োগে আমরা কুণ্ঠিত হইনি। শেষ বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক-বন্ধুদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

"লং মার্চের কাহিনী"-গুলোর মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের যে ত্যাগ, সাহস আর বীরত্বের পরিচয় অভিব্যক্ত—তা আমাদের পাঠকদের কর্মপথে প্রেরণা জোগাবে এই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

অজিতকুমার বিশ্বাস

ভূমিকা, প্রসঙ্গ পরিচিতি ও অনুবাদ প্রসঙ্গে

ভূমিকা

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ী অগ্রগতির বন্ধুর পথে যে অসমসাহসিক, অভাবনীয় অভিযান পরিচালনা করে এসেছে—**লং মার্চ** তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অভিযান হিসাবে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত। **সঠিক নেতৃত্বাধীনে বিপ্লবী শ্রমজীবী জনগণ যে কী অমিত শক্তির অধিকারী, শ্রেণী-শত্রুবাহিনীর সকল প্রকার আক্রমণ ও পশুশক্তিকে পরাজিত করে, প্রাকৃতিক সকল বাধা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে তারা যে চূড়ান্ত বিজয়লাভে সমর্থ—এই বাস্তব সত্যের দৃপ্ত ও প্রদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে "লং মার্চের" এই কাহিনীগুলোতে।**

প্রসঙ্গ পরিচিতি

চীনবিপ্লবের ইতিহাসের অত্যন্ত জটিল একটি অধ্যায়ে ১৯৩৪-৩৬ সালে চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজ বিপ্লবের শত্রুবাহিনীর দুর্ভেদ্য অবরোধকে ভেঙে ফেলে একটি সুদীর্ঘ অভিযাত্রা সংগঠিত করে। মোট ২৫,০০০ লী অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার মাইল দীর্ঘ, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে চীনের বিপ্লবের মূল শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিজস্ব, নিরাপদ এলাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এই সুদীর্ঘ অভিযানই **'লং মার্চ'** নামে পরিচিত।

বহুগুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত কুয়োমিনটাং সৈন্যবাহিনীর আক্রমণকে পরাস্ত করে, অভাবনীয় দুর্গম, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই সফল অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে চীনের বিপ্লবের ও বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের বিজয়ের এক নূতন অধ্যায় রচিত হচ্ছিলো। এখানেই লং মার্চের ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য।

সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের ফার্স্ট ফ্রন্ট বাহিনীর কিয়াংসি থেকে উত্তর শেনসি পৌঁছার জন্য ১৯৩৪ সালের

অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত যে এক বছর সময় লেগেছিলো তাই বুঝি লং মার্চের সময়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লালফৌজের তিনটি মূল বাহিনীর উত্তর চীনের "শেনসি, কানসু ও নিংসিয়া"র মুক্ত অঞ্চলে পৌঁছতে সময় লেগেছিলো দু বছর। এই পুরো দু'টি বছরই, বলা চলে, লং মার্চের কাল।

সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির শাসনে চীনের জনগণ দীর্ঘকাল নিপীড়িত হয়েছেন। সেখানে নিপীড়ন যেখানেই জেগে উঠেছে বিরামহীন, অন্তহীন প্রতিরোধ। লং মার্চের কাহিনী সেই অপরাজেয় প্রতিরোধ সংগ্রামেরই ইতিবৃত্ত। অসম্ভব রকমের সুকঠিন পরিস্থিতিতে পরিচালিত দীর্ঘ, তিক্ত সেই সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ভরে রয়েছে চীনের শ্রমজীবী জনগণের অতুলনীয় বীরত্বের অজস্র কাহিনীতে। আঘাত, আক্রমণ ও দুঃখজয়ের সেই প্রায়-অবিশ্বাস্য কাহিনী থেকে বোঝা যাবে **১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর** চীনের জনগণের সাধারণতন্ত্রের বিজয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ; বোঝা যাবে, **মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম তাৎপর্য-মণ্ডিত এই ঘটনাটিকে।** কমরেড মাও সে-তুঙ-এর ভাষায়: "চীন এবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে!" পৃথিবীর ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বব্যাপী মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সেদিন থেকে অগ্রগতির নূতন এক সন্ধিলগ্নে উপনীত হলো। আসলে লং মার্চের বীরেরা সেই নূতন ইতিহাসেই বাস্তব রূপকার। তাঁদের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোই লং মার্চে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীদের নিজেদের বর্ণনায় বিধৃত।

ঐতিহাসিক লংমার্চের পটভূমির দিকে এখন একবার ফিরে তাকানো যাক্।

১৯৩১ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তর-পূর্ব চীনের বিরাট অঞ্চল দখল করে নিলো। চীনের জাতীয় জীবনে সেদিন কী দারুণ বিপর্যয়! বিস্ময়ের কিছুই নেই চীনের "জাতীয়তাবাদী" কুয়োমিনটাং দল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে বিদেশী আক্রমণকারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে, দেশপ্রেমিক ও শ্রমজীবী জনগণ এবং কমিউনিস্ট

নিধনের বর্বরতায় মেতে উঠলো। দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্যচীনের, কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্ত অঞ্চলকে দমন করার ও নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারেই তারা ছিলো বেশি তৎপর।

১৯৩৩ সালের অক্টোবরে চিয়াংকাইশেক দশ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে পঞ্চমবারের মতো কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত বিপ্লবী অঞ্চল বিশেষ করে কিয়াংসি প্রদেশের কেন্দ্রীয় চীনা সোভিয়েত শাসিত অঞ্চলে অবরোধ অভিযান শুরু করে। এর মাঝে সারা চীনে কমিউনিস্টদের তিন লক্ষের মতো সশস্ত্র সৈন্য সৃষ্টি হয়েছে, অসামরিক রক্ষী বাহিনীর বিপুল বিস্তার ঘটেছে,—কৃষি বিপ্লবের অনুসরণের ফলে কৃষক জনগণের বিপ্লবী প্রেরণা ও সংগঠন প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অনেক বেড়েছে।

জাপানের ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক আহ্বান সারা চীনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বরেই ঘটলো বিখ্যাত 'ফুকিয়েনের ঘটনা'। কুয়োমিনটাং-এর উনিশ নম্বর সেনাবাহিনী সাই তিং-কাই, চিয়াং কুয়াং-নাই এর পরিচালনাধীনে ফুকিয়েনের 'জনগণের বিপ্লবী চীন সাধারণতন্ত্রী সরকারের' লি চি-সেন ও অন্যান্য কুয়োমিনটাং সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লাল ফৌজের সঙ্গে চুক্তি করে চিয়াং কাই শেক-এর কুয়োমিনটাং বাহিনীর বিরোধিতা ও জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ফলে চিয়াং-এর পঞ্চম অবরোধ অভিযান কালে লালফৌজ বিরাট সুবিধাজনক একটা অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'বামপন্থী' নেতৃত্বের কবলে থাকার জন্য মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে অপসারিত করে তারা পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন। তারা উনিশ নম্বর বিপ্লবী কুয়োমিনটাং বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করেন—ফলে পুরো বিদ্রোহী বাহিনীটি চিয়াং বাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হলো। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক সর্বনাশা পথ ঐ 'বামপন্থী' নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। মাও সে তুং-এর সঠিক রণনীতিকে বরবাদ করে দিয়ে তারা অনেক বেশি সুসজ্জিত কুয়োমিনটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে **প্রকাশ্য সশস্ত্র সম্মুখ সমরের পথ** গ্রহণ করলেন। ফল যা হবার তাই হলো। তারপর এলো ওদের তথাকথিত সর্বাত্মক বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এক বছর ধরে তীব্র, তিক্ত সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে লালফৌজ কিছু কিছু আংশিক সামরিক বিজয় অর্জন করলেও চিয়াং বাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হলো না। মুক্ত অঞ্চলগুলো ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়তে লাগলো। লালফৌজ বেশি বেশি করে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। চীনের বিপ্লবের সে এক চরম মুহূর্ত!

এরকম একটা চরম মুহূর্তে নিজের অবশিষ্ট শক্তিকে অক্ষত রাখার জন্য লালফৌজ শত্রুর অবরোধ ভেঙ্গে লং মার্চ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে লালফৌজের জাপান-বিরোধী অগ্রসর বাহিনীর কিয়াংসি থেকে দক্ষিণে আনহুই অভিমুখী অভিযান বিপুলতর চিয়াং বাহিনীর আক্রমণে (১৯৩৫ সালের জানুয়ারী) ব্যর্থ হল। এর পাশাপাশি ৬ষ্ঠ বাহিনীর ও ২৫শ বাহিনীর দুটি অগ্রগামী অভিযাত্রী দল অবশ্য দুটি অগ্রসর মুক্তঅঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। এই তিনটি বাহিনীর ঐ কার্যকলাপ কুয়োমিনটাং শত্রু বাহিনীর সকল পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হলো—ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রথম সৈন্য বাহিনীর পক্ষে লং মার্চের প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজগুলো এর মাঝে সম্পন্ন করা মোটামুটিভাবে সম্ভবপর হলো।

১৯৩৪ সালের অক্টোবরে প্রথম সেনাবাহিনীর মোট ৮৫,০০০ সৈন্য এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ সহ মোট প্রায় একলক্ষ মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীনে নিজেদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল পরিত্যাগ করে লং মার্চের জন্য যাত্রা শুরু করলেন। মূল বাহিনীটি যাতে নির্বিঘ্নে অবরোধ ভেঙে বের হয়ে যেতে পারে তার জন্য একটি অংশকে চেন ই, সিয়াং ইং প্রভৃতি সেনানীদের নেতৃত্বে রেখে দেওয়া হলো গেরিলা যুদ্ধ চালনা করে পাল্টা অবরোধ রচনার জন্য। চিয়াং বাহিনীর চারলক্ষ সৈন্যের চারটি অবরোধ গুড়িয়ে দিয়ে লালফৌজের প্রথম বাহিনী ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে হুনান ও কোয়াংসির সীমান্ত অঞ্চলে উপনীত হলো। লালফৌজের প্রথম বাহিনী যাতে হুনান-হুপে সীমান্তবর্তী দ্বিতীয় লালফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে—তার জন্য চিয়াং-শেক দ্রুত ছয়গুণ শক্তিশালী একটি বাহিনী প্রেরণ করে। চিয়াং-এর নির্দেশে কোয়াংসির সশস্ত্র জমিদারেরা উত্তর দিক থেকে লালফৌজকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। লালফৌজের প্রথম বাহিনীর পক্ষে অবস্থা সত্যিই ঘোরালো ও বিপজ্জনক হয়ে উঠলো।

মাও সে-তুং এবং অন্যান্য কমরেডদের যুক্তির চাপে পড়ে এবং নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কমরেডদের সমর্থন ছিলো বলে শেষ পর্যন্ত প্রথম বাহিনী গতিপথ পরিবর্তন করতে রাজী হয়—এবং কিউ চাও-এর দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব কিউচাও অঞ্চল দ্রুত দখল করে নেয়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে দুরতিক্রম্য উকিয়াং নদী অতিক্রম করে লালফৌজ উত্তর কিউচাও-এর সদর শহর সুনয়ি দখল করে নেয়। চিয়াং কাইশেকের ধারণা ছিলো কোনো মানুষের পক্ষে উকিয়াং নদী অতিক্রম করা সম্ভব নয়—কারণ এই নদীটি ছিল প্রকৃতির এক অভিনব প্রতিরোধ, নদীতে খরস্রোত, খাড়া ভাঙনে ভরা তীর। চিয়াং তাই ভেবেছিলেন এবার কমিউনিস্টদের সমূহ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী! কিন্তু **বিপ্লবী মানুষের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞার সামনে প্রকৃতি ও শ্রেণীশত্রুর কল্পনাতীত দুর্জয় প্রতিরোধও যে হার মানে তাই প্রমাণিত হলো।** কার্যতঃ উকিয়াং নদী অতিক্রম করে সুনয়িতে উপনীত হওয়ার মধ্য দিয়ে চীনের বিপ্লব এক নূতন অপরাজেয় অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হলো। তার পরবর্তী ইতিহাস সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববিজয়ী ইতিবৃত্তে অবিনশ্বর একটি অধ্যায়েরই সূচনা করেছে। সুনয়িতে বারোদিন লালফৌজ বিশ্রাম গ্রহণ করে, চার হাজারের বেশি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে। এই অবসরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর বর্ধিত একটি অধিবেশন আহ্বান করে। এই অধিবেশন "সুনয়ি সম্মেলন" নামে সুপরিচিত। চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে এই সম্মেলনের গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম। এই সম্মেলন থেকে শুরু করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও সে তুং-এর অবিচল নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো—১৯৩৫ সালের জানুয়ারী সেই দিনগুলোতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে নূতন যুগের সীমারেখা চিহ্নিত হচ্ছিল—তার গুরুত্ব তাই সীমা পরিসীমা হীন।

কিন্তু এতো ছিলো সহস্র বাধা-বিপত্তির একটি মাত্র। "বামপন্থী" বীরপুরুষেরা ভুলনীতি অনুসরণ করে চিয়াং-এর পঞ্চম অবরোধ কালে রীতি-মতো ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রচার অভিযানের গুরুত্ব তাদের কাছে উপেক্ষিত হলো—শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষাই হয়ে দাঁড়ালো তাদের একমাত্র ভাবনা। ফলে লালফৌজে নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতা দেখা দিলো,

মনোবল ক্ষুণ্ণ হলো। সেনানীমণ্ডলী ও পশ্চাৎবর্তী সংগঠনের জন্য ব্যাপক শক্তি নিয়োজিত হওয়ার ফলে সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে চলা ঢিমে তালে চলছিল। বেশ কয়েকবার শত্রু বাহিনীর পশ্চাদনুসরণের ফলে ঘোর বিপদ দেখা দিলো। **১৯৩৫ সালে জানুয়ারীতে সুনয়িতে পৌঁছার আগে লাল ফৌজের প্রথম বাহিনীর শতকরা ষাট ভাগ শক্তিই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।**

এতে অবশ্য শাপে বর হলো। পার্টির নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্য বহু সদস্য এমনকি 'বামপন্থী' ভুল করেছিলেন এমন অনেকেই 'বামপন্থার' বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠলেন। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম সুনয়ি সম্মেলনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলো। মাও সে-তুং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন—ঐ সময় থেকে মাও সে-তুং-এর পরিচালনাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

সুনয়ি সম্মেলনের পর থেকে লাল ফৌজের প্রথম বাহিনী **সচল রণকৌশলের ধারা** অনুসরণ করলো, উদ্যোগ গ্রহণ করলো নিজের হাতে। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে শত্রুপক্ষের চার ডিভিশন সৈন্য সুনয়ির নিকবর্তী স্থানসমূহের যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হলো। লং মার্চ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম বিরাট বিজয় অর্জিত হলো। তারপর প্রথম বাহিনী শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে তাদের নাগালের বাইরে সরে পড়লো—সুনয়ি পরিত্যাগ করে চলে গেলো খরস্রোতা সোনালি বালির নদীটি অতিক্রম করে ১৯৩৫ স'পর মে মাসের মাত্র নয় দিন ও নয় রাত্রির মধ্যে!

লক্ষ লক্ষ শত্রু সৈন্যের আক্রমণকে পরাভূত করে লালফৌজ সুনিশ্চিত বিজয় অর্জন করে উত্তর অভিমুখে সে-চুয়ানের দিকে এগিয়ে চললো। অনেকের মতে পৃথিবীর অন্যতম দুরতিক্রম্য তাতু নদী পার হয়ে, বরফাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে লালফৌজ মাওকুংয়ে উপস্থিত হলো। এখানে লালফৌজ চাং কুয়ো-তাও, সু সিয়াং-চিয়েনএর চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে সেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে মিলিত হলো। চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও সে-তুংএর নেতৃত্বে সেচুয়ান-শেনসি-কানসু অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে **জাপ বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ** গড়ে তোলার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখানে প্রচণ্ড বাধা এলো চাং কুয়ো-তাও-এর পক্ষ থেকে। চাং তখন মানসিক দিক থেকে একেবারে হতোদ্যম, বিপ্লবের বিজয়ে নিরাশাবাদী এবং দক্ষিণ পশ্চিম চীনে সরে পড়ার পক্ষপাতী। তিনি তাঁর পরামর্শ মতো পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানালেন। পার্টির আদেশে লালফৌজ দু'মাস সুংপানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সভার আলোচনা অনুসারে লালফৌজের ভাবী কার্যক্রম গ্রহণ করে। চাং কুয়ো-তাও মৌখিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনেও নিলেন।

১৯৩৫ সালের আগস্টে লালফৌজ দু'টি পথ ধরে উত্তর অভিমুখে এগিয়ে চললো। দক্ষিণ ভাগের নেতৃত্ব রইলো কেন্দ্রীয় কমিটি ও মাও সে-তুং-এর হাতে। বামভাগের বাহিনী আপাতে পৌঁছে যাওয়ার পর চাং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন এবং দক্ষিণে ফিরে যাওয়ার জন্য তার অধীনস্থ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, চুতে ও লিউ পো চেং-কে কার্যতঃ জোর করে আটক করলেন। খোলাখুলি তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তরে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। অক্টোবরে উচিতে উপনীত হয়ে তারা পঞ্চদশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। লালফৌজের এই দু'টি বাহিনী মিলিত ভাবে শত্রুবাহিনীর আক্রমণকে পরাজিত করে শেনসি কানসু অঞ্চলে নিজেদের অধিকার সংহত করে ফেললো—এই অঞ্চলই কালক্রমে সুবিখ্যাত **শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল** হিসাবে ইয়েনানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। চীনের বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই ইয়েনানই ছিলো চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মুক্ত অঞ্চলের সরকারের সদর দপ্তর। চীনের বিপ্লবতীর্থ এই ইয়েনান বিশ্বে একান্ত পরিচিত একটি নাম।

এদিকে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লালফৌজের দ্বিতীয় বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে প্রথম বাহিনীর নিরাপদ অগ্রগমনকে নিশ্চিত করে এবং প্রথম বাহিনীর অগ্রগতির পথ অনুসরণ করে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে কান্টসেতে উপনীত হয়। ওখানে চতুর্থ বাহিনী চাং কুয়ো-তাও-এর নেতৃত্বে অপেক্ষায় কাল কাটাচ্ছিল। উভয় বাহিনী এখানে মিলিত হলো। চাং কিন্তু পাল্টা একটা ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় বাহিনীর জেন পি-শি, হোলাং এবং কুয়ান শিয়াং-ইং প্রভৃতি সেনানীরা চাং-এর বিচ্ছেদমূলক

পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং চু তেও লিউ পো-চেং-এর সঙ্গে মিলে চাং-এর পলায়নী-নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম শুরু করলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নীতি এবং এই প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে চাং নিরস্ত হতে বাধ্য হলেন, তার সৃষ্ট তথাকথিত পার্টি কেন্দ্র ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে চতুর্থ ও দ্বিতীয় বাহিনীকে উত্তর অভিমুখে পরিচালনা করে নিয়ে চললেন। অক্টোবর মাসে হুইনিং-এ তারা লালফৌজের প্রথম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। **লালফৌজের এই প্রধান তিনটি বাহিনীর মিলনের মধ্য দিয়ে দুই বৎসর ব্যাপী লং মার্চের বিজয়ী পরিসমাপ্তি ঘটলো।** শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের ইতিহাসে বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চ-জাগানো একটি বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ হলো বিজয়ী শ্রমজীবী মানুষের অপরাজেয়তার রক্ত স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে।

চীনের এবং পৃথিবীর ইতিহাসে লং মার্চ তুলনাবিহীন এক মহাকাব্যের ইতিবৃত্ত। ২৫০০০ লী অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার মাইল দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমাকালে চীনের এগারোটি প্রদেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল লালফৌজকে। শুধু তাই নয়, এগিয়ে চলার পথে চিয়াং বাহিনীর সমস্ত সশস্ত্র শক্তিতে প্রতিপদে পরাস্ত করে, প্রকৃতির ভীষণতম প্রতিবন্ধকে জয় করে, অতিক্রম করে, সামন্ত সশস্ত্র শাসকদের হিংস্র বাহিনীর আঘাতকে পরাস্ত করে, পার্টির অভ্যন্তরীণ 'বাম' হঠকারিতা এবং পরাজয়ের হতাশার আত্মবিনাশী বিড়ম্বনাকে জয় করে মৃত্যুর হাত ধরে পায়ে পায়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল জীবনের বিজয়ী মুক্ত প্রসর প্রান্তরে। শত্রুকে এড়িয়ে লালফৌজকে চলতে হয়েছিল জনবিরল ঘন অরণ্য, কুল শ্বাপদ হিংস্রতায় ভরা অঞ্চল দিয়ে, দুস্তর অরণ্য, দুরতিক্রম্য বেগবতী স্রোতস্বিনী পার হয়ে, প্রাণঘাতী তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমি অতিক্রম করে, প্রায় ষোল হাজার ফুট উচ্চ বরফাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী পার হয়ে। এই সব অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির দারিদ্র তুলনাহীন, খাদ্যাভাব কল্পনাতীত; তাছাড়া ঐতিহাসিক কারণেই চীনের মূল হান জনসমষ্টির প্রতি এই আদিবাসী উপজাতিদের ছিলো অপরিমেয় ঘৃণা, অবিমিশ্র শত্রুতার মনোভাব। কিন্তু মার্কসবাদের লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এই অসম্ভব অভাবনীয়কে জয় করে নেওয়ার অফুরান শক্তি এনে দিয়েছিলো নূতন ইতিহাসের স্রষ্টা কমিউনিস্টদের—তাদের অপরাজেয় পার্টিকে।

লং মার্চের সাফল্য সম্ভব হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই জন্য যে, লালফৌজ পরিচালিত হয়েছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারায় সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক সত্যকে চীনের বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে সমর্থ এমন বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী সেই পার্টি গড়ে তুলতে পেরেছিল। বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামই শুধু নয়—সঠিক পথে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পরিচালনা করে পার্টিকে তা বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার অভাবনীয় শক্তি এনে দিয়েছিলো। পার্টির সঠিক নেতৃত্ব ব্যতীত লং মার্চের এই অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন নিতান্ত অসম্ভব, একান্ত অসাধ্য হতো।

লং মার্চের সাফল্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমরেড **মাও সে-তুং**-এর কথাগুলোই স্মরণ করতে হয়। ইয়েনানের সেই গুহায় বসে মার্কিন সাংবাদিক এডগার স্নোর কাছে ১৯৩৬ সালে মাও সে তুং মন্তব্য করেছিলেন :

"লালফৌজের বিজয়ী অভিযাত্রা এবং নিজের জীবন্ত শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কানসু ও শেনসিতে তাদের বিজয়ী উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিলো প্রথমতঃ কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের সোভিয়েত জনগণের [চীনের মুক্ত অঞ্চলের সরকারের শাসনাধীন জনগণের—অনুবাদক] মূল কর্মীবাহিনীর বিরাট কর্মকুশলতা, সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রায় অতিমানবিক সহনশীলতা ও বৈপ্লবিক প্রেরণার জন্য। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি সবসময় অনুগত ছিলো, আছে এবং থাকবে। প্রতিটি সুবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধেই তা নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যেই পার্টির অপরাজেয়তা ও চূড়ান্ত বিজয়ের মূল নিহিত রয়েছে।" **এডগার স্নো**: "রেড স্টার ওভার চায়না"; পেলিকান; পৃঃ ২১০।

চীনের জনগণের সুপ্ত সেই কর্ম-কুশলতা, সাহস, দৃঢ়তা ও সৃজনশীলতা এবং প্রায় অতি-মানবিক সহনশীলতার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিজনিত রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীই লং মার্চের কাহিনী থেকে। আমরা জানতে পারবো লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের বিবরণ থেকে সেই কাহিনীগুলো থেকে ফুটে উঠেছে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণের অসম্ভবকে সম্ভব করার নিশ্চিত অবিচল প্রতিশ্রুতি।

'প্রসঙ্গ-পরিচিতি' উপলক্ষে উপস্থাপিত প্রতিটি তথ্য অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দলিল ও গ্রন্থাদির সঙ্গে মিলিয়ে লিখিত হয়েছে। তবু অনবধানতাজনিত কোনো ভুলভ্রান্তি কোনো বন্ধু দেখিয়ে দিলে তা আনন্দের সঙ্গে সংশোধনের অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলাম।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

১৯৫৮ সালে পিকিং থেকে প্রকাশিত মূল ইংরাজী পুস্তক থেকেই কাহিনীগুলো অনুবাদ করেছি। চীনের বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের নাম প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণ অনুযায়ী ভাষান্তরিত করে দিয়েছি। সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও পরিচিতি-জ্ঞাপক উপাধিগুলোও যথাযথ স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করে দিয়েছি। চীনের সেনাবাহিনী থেকে পদ ও মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধিসমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে-কিন্তু ভাষান্তরকালে কালানুগ যথার্থতার জন্য আমি সেগুলো অপরিবর্তিতই রেখেছি।

বহু বন্ধু ও সহযোগী সাথী অনুবাদ প্রসঙ্গে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। চীনের বিপ্লবের ইতিহাসকে ও নেতৃত্বের ভূমিকাকে একদেশদর্শী-ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার নানা অপচেষ্টা, নানা কৌশলে ও ভঙ্গীতে চালানো হচ্ছে। তাই ইতিহাসের মুখোমুখী হয়ে সত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যগ্রতা থেকেই **লং মার্চের কাহিনীগুলো** অনুবাদের এই প্রয়াস। ভাবতে অবাক লাগে, এই অবিস্মরণীয় কাহিনীগুলোর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের আয়োজন এতোদিন অবহেলিতই রয়ে গেছে! 'লং মার্চের কাহিনী' নিয়ে একটি রম্যরচনা হাজির করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলেই সেই কাহিনীগুলোর মূলানুগ অনুবাদ করেছি।

আর এই অবসরে চীনের মহান বিপ্লবের বিজয়ের পঁচিশ বছরে পদার্পণের প্রাক্কালে মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ চীনের বীর জনগণের যুগান্তকারী সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের সঠিক পথপ্রদর্শক ও পরিচালক চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১০৭৪

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৫
ভূমিকা, প্রসঙ্গপরিচিতি ও অনুবাদ প্রসঙ্গে	৬
লং মার্চে চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে	১৭
উকিয়াং পেরোবার সংগ্রাম	২৬
আমাদের স্থনয়ি জয়ের কাহিনী	৩৭
সোনালি বালির নদী পার হয়ে এলাম	৪৯
তাতু নদী জয়ী বীরেরা	৬৪
লুটিং সেতু জয়ের সংগ্রাম	৭৪
বরফের পাহাড় পেরিয়ে	৯১
লালফৌজের সৈনিকের সেই টুপিটি !	৯৯
জলাভূমি জয়ী বীরেরা	১০৫
লং মার্চে লাল ফৌজের ক্ষুদে সৈনিক	১১২
ঈ জনগণের সঙ্গে প্রথম দেখা	১১৯
হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন	১৩৩
লাতসেকৌ-এ লাল পতাকা	১৩৮
চিরউড্ডীন লাল নিশান	১৪৭
লং মার্চের গতিপথ (ম্যাপ)	১৬
মাও সে-তুং	২০
লুটিং সেতু ও বিজয়ী লালফৌজ	৮০

লং মার্চে চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে

কর্নেল চেন চ্যাং-ফেঙ

মনে পড়ছে, ১৯৩৫-এর এপ্রিলের একটা সন্ধ্যায় আমরা সোনালি বালির নদী তীরে পৌছেছি। আমরা মানে তৃতীয় লাল ফৌজের প্রথম, পঞ্চম, নবম দলগুলো এবং ক্যাডেটদের রেজিমেণ্ট—সবাই আমরা লালফৌজের প্রথম বাহিনীর সৈনিকেরা। কেন্দ্রীয় কমিটির লোকেরাও রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। উকিযাং পার হয়ে আসার পর সোনালি বালির নদীই হলো আমাদের পথের সামনেকার প্রথম বড়ো নদী। জলে ভরা নদী, ক্রুদ্ধ ড্রাগনের মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে তার ঢেউগুলো। সমস্ত নেতারা ভীষণভাবে চিন্তিত কী করে নদী পাড়ি দেওয়া যাবে সে কথা ভেবে, কারণ নদী পেরোবার মতো নৌকো ইত্যাদি কিছুই নেই আমাদের। চেয়ারম্যান মাও এসব আলোচনায় একান্ত-ভাবে মগ্ন—সারারাত ধরে সেই আলোচনাই চলছিলো।

আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। ভোর হওয়ার ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে নদী পার হলাম। পেরিয়ে মাটিতে পা দিয়েছি কি দিই নি, অমনি তিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল লিউ পো-চেং এর কাছে চলে গেলেন যাত্রাপথের পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য। এদিকে আমি বের হলাম তাঁর জন্য অস্থায়ী একটা অফিস ও মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে বের করতে।

খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলাম না। নদীর তীর জুড়ে খণ্ড খণ্ড পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কয়েকটা গর্ত খাড়াই-এর গায়ে গায়ে;—স্যাঁতসেতে ঐ গর্তগুলোতে টিপ টিপ করে জল পড়ছে, সেই গর্তগুলোকে কোনো মতেই গুহা বলে অভিহিত করার উপায় নেই—এতো ছোটো সেগুলো। বিছানা পাতার জন্য তক্তা বা ঐ ধরনের কিছু অথবা খড় অনর্থক খুঁজে বেড়ালাম। অবশেষে এক টুকরো অয়েলক্লথ বিছিয়ে তার ওপর কম্বলখানি ছড়িয়ে দিলাম। ভাবলাম যেমন করে হোক চেয়ারম্যান

মাও শুয়ে থাকতে পারবেন—গত সারারাতে একটুও জিরোতে পারেন নি। আসলে গত কয়েকটা দিন একটুও বিশ্রাম নেওয়া হয়নি তাঁর।

আমার এর পরের কাজই হলো তাঁর দলিলপত্র—ম্যাপ এবং কাগজপত্রগুলো মেলে রাখা। সাধারণতঃ তাঁর সেক্রেটারী কমরেড হুয়াং-এর সঙ্গে মিলেই কোথাও ক্যাম্প করা হলে এ কাজটি আমি করতাম। আমরা যা হোক একটা টেবিল বা ডেস্ক বানিয়ে নিতাম। কিন্তু এখানে ওরকম কিছু বানিযে নেওয়ার কোনো উপায়ই নেই—তাছাড়া কমরেড হুযাং রযে গেছেন তখনও নদী'র ওপারে। কী করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। গর্তের গাযে একটা ম্যাপ টাঙিযে দিতে চেষ্টা করলাম;—হলো না;—ঝুরঝুরে বালি, পেরেক আটকে রাখার কোনো উপায়ই নেই—তাছাডা দলিলগুলো ছড়িয়ে রাখার কোনো জায়গাই নেই। অনেকখানি সময় কাটিযে ফেলেছি এর মাঝে, যে কোনো মুহূর্তে চেয়ারম্যান মাও সভা থেকে চলে আসতে পারেন। অথচ এক ফোঁটা জলও ফুটিযে নিতে পারি নি। আমি জানতাম তার গরম জলের দরকার হবে—যা ঝক্কি গেছে! দলিল দস্তাবেজের কথা ছেড়ে বেরিযে পডলাম জলের কিছু একটা হিল্লে করতে পারি কি না দেখতে।

চেযারম্যান মাও যখন ফিরে এলেন তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে, এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওখানে পৌছে দেখি ভীষণ চিন্তামগ্ন হযে তিনি দাঁডিয়ে রয়েছেন।

"আপনি ফিরে এসেছেন?"—আমি বললাম।

"হুঁ—সব কিছু তৈরি তো?"

"যা পারি করেছি"—বলে "বিছানা"টি দেখিযে দিলাম। "তক্তা বা ঐ ধরনের কিছু পেলাম না, তাই যা হোক করে এই করেছি। আপনি কি একটু গডিয়ে নেবেন? তার মধ্যে জল ফুটে যাবে।"

আমি যাচ্ছিলাম জলের কি হলো দেখে আসতে, উনি আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—

"কাজের জায়গা একটু বের করতে পারলে?"

আমি কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, "কমরেড হুয়াং এখনও আসেন নি। ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করার মতোও কিছু পেলাম না। আপনি আগে একটু জিরিয়ে নিন আর এক ফোঁটা জল খেয়ে নিন না?"

তিনি আমার দিকে এক কদম এগিয়ে এলেন, আমার কোনো কথাই যেনো শুনতে পান নি, বললেন, ভীষণ গুরুত্ব সহকারে কিন্তু একটুও রাগ না করেই বললেন,—"এরকম একটা মুহূর্তে কাজটাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী বিষয়। বিশ্রাম, খাওয়া বা জল কোনো কিছু ধর্তব্যই নয়। আমাদের বিশ থেকে ত্রিশ হাজার কমরেড এখন পর্যন্ত নদী পার হওয়ার জন্য ওপারে অপেক্ষা করছেন। ত্রিশ হাজার জীবন সমূহ বিপদের মুখে।"

কী বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম আমার বুক ধুকধুক করছে। তিনি আমার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, কাঁধে ধীরে হাত রেখে বললেন,—"যাও অন্য কিছুর আগে আমার জন্য যা হোক একটা তক্তা বা ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করা চলে এমন একটা কিছু খুঁজে নিয়ে এসো।"

আমি নিজেকে স্থির রেখে ছুটে চললাম, এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোটো তক্তা পেলাম, মনে হলো একটা গর্তের মুখ বন্ধ করার দরজা হিসাবে তা ব্যবহার করা হয়েছিলো। চেয়ারম্যান মাও তা পেতে নিতে সাহায্য করলেন, নিচে খুঁটি পুঁতে তাকে সমান ও শক্ত করে নেওয়া হলো, তার ওপর তাঁর ম্যাপ ও দলিলগুলো ছড়িয়ে দিলাম। তারপর মনে পড়লো জলের কথা, এর মাঝে নিশ্চয়ই তা ফুটছে, তা আনতে যাচ্ছি চেয়ারম্যান মাও আবার ডাকলেন আমাকে।

"চেন চ্যাং ফেঙ!"

"বলুন?"

আমি গর্তের ভিতরে ঢুকলাম, অতি সন্তর্পণে আমাদের "ডেস্ক"টি পার হয়ে গেলাম। তিনি বললেন—

"তোমাকে একটা শাস্তি দেবো ভেবেছি, বুঝলে?" যদিও তাঁর স্বর ছিলো নরম আর চোখে ছিলো সহৃদয় দৃষ্টি তবু যেন কেমন থমথমে মনে হচ্ছিলো পরিবেশটা। বুঝতে পারছিলাম কাজে গলতি করে ফেলেছি—একেবারে নাচার হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"আমি চাই তুমি আমার পাশে জেগে থাকবে।"

টের পাচ্ছিলাম একটা অস্বস্তির হাসি তখন আমার মুখে, তাঁর উল্টো দিকেই বসে পড়লাম। বললাম—

"ঠিক আছে।"

সারা ডেস্ক জুড়ে টেলিগ্রাম আর দলিলপত্র ছড়ানো। যে ফীল্ড-টেলিফোন সিগন্যাল-কোর থেকে পাতা হয়েছে তা সারাক্ষণ বেজেই যাচ্ছিলো আর তিনি কাজে একেবারে ডুবে রইলেন। নিজের জন্য একটা মিনিটও ব্যয় করেন নি। চোখের জল আটকে রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিলো যখন ভাবতে লাগলাম যে তাঁর জন্য ডেস্কটার ব্যবস্থা না করে রেখে তাঁব অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছি, যদি আমার কাজ বুঝে আগেই তা করে নিতাম।

অসম্ভব রকম ঘুম পাচ্ছিলো আমাব, তিনি যখন কাজ কবতেন সেই অবসরে তাঁর পাশে কোনরকম করে শুয়ে পড়া আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে জেগে থাকতে হবে বলে "শাস্তি" দেওয়ার যে কথা তিনি বলেছিলেন তা' কী আমি জানতাম—যদিও তিনি পরিহাস করেই কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলাম সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন, ঘুমানোর সামান্য কোনো ইচ্ছাই তাঁব দেখা যাচ্ছে না, আব মাঝে মাঝেই হাসিমুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিলো। খানিকক্ষণ পরে গিয়ে জল নিয়ে এলাম এবং ঠাণ্ডা করাব জন্য খানিকটা ঢেলে নিলাম।

দু' দু'বার খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে নেওয়া যায় এই পরিমাণ সময় কেটে যাওয়ার পর চেয়ারম্যান মাও থামলেন এবং লম্বা হয়ে গড়িয়ে নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

"আজ বেশ কয়েক বছর তুমি আমাব সঙ্গে রয়েছো, এখনও বোঝো না কোনটা সব কিছুব আগে দরকার? সবার আগে তোমাব কাজ হলো বসে কাজ করা যায় এমন একটা জায়গা খুঁজে বেব করা। খাওয়া আব বিশ্রাম তার অনেক পরের কথা। তোমার বোঝা চাই কাজই হচ্ছে সমস্ত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরী ব্যাপাব।" মিনিট খানেক থামলেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমারও একটু ঘুমানো দরকার, তুমি তো চোখই খোলা রাখতে পারছো না।"

এসবের পর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি নিজের কথা ভাবতে লাগলাম। নিজেকে দমন করতে পারলাম না—আমার কান্না পেয়ে গেলো। আমাকে সমালোচনা করা হয়েছে বলে নয়—তা ছিলো দুঃখ আর আনন্দের [illegible] মিশ্র অনুভূতি,—স্নেহশীল পিতামাতা গুরুগম্ভীরভাবে অথচ রূঢ় না হয়ে যখন



মাও সে-তুঙ

[লং মার্চের দিনগুলোতে ।]

আপনাকে তিরস্কার করেন—অনুভূতিটা ছিলো অনেকটা সেই রকমের।

বিছানার পাশে শুয়ে পড়লাম—কিন্তু ঘুম এলো না। নানা স্মৃতি কথায় মন ভরে উঠতে লাগলো …

পাঁচ বছর আগে মার্চের শেষে চতুর্থ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে বদলী হয়ে চীনের বৈপ্লবিক ফ্রন্ট কমিটিতে চলে এলাম চেয়ারম্যান মাও-এর আর্দালী হয়ে। ঐ সময়ে তাঁকে আমরা "কমিশার" বলতাম, তখনও "চেয়ারম্যান" মাও বলতাম না। অত্যন্ত সাধারণ কিছু জিনিসপত্র ছিল তাঁর নিত্য ব্যবহার্য, সুতো আর উলের তৈরি দু'খানা কম্বল, একখানা চাদর, দু'টি সাধারণ ফৌজী জ্যাকেট এবং পাজামা, একটা সোয়েটার, তালি দেওয়া একখানা ছাতা. কলাই-করা একটা মগ ভাত খাবার পাত্র হিসাবে তা ব্যবহার করা হতো আর ছিলো নয়টি খোপওয়ালা একটি ধুসর রঙের ব্রীফ কেস। যাত্রাকালে ছাতা ও ব্রীফ কেসটা সাধারণতঃ তিনি নিজেই হাতে করে বয়ে নিতেন—আর বাকীগুলো আমি একটা মোট পাকিয়ে নিতাম। ক্যাম্প করা হলে দু'খানা তক্তা কুড়িয়ে এনে বিছানা করে কম্বল পেতে চাদরখানি বিছিয়ে দিতাম। বাকী জিনিসপত্র দিয়ে তিনি একটা বালিশ বানিয়ে নিতেন।

রাতে খুব কমই তাঁর ঘুমানোর সময় থাকতো। সন্ধ্যার খাবার খেয়েই ম্যাপ, কাগজপত্র ও কলম নিয়ে আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে বসে যেতেন। আমি পাশে বসে থাকতাম। আমার বয়স খুবই কম আর রাত-জাগা আমার একেবারে পোষাতো না। প্রায়ই মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘুম লাগাতাম। মাঝরাতের দিকে আমাকে ডেকে তুলতেন,—বলতেন "একটু ঠাণ্ডা জল পেলে মন্দ হয় না"। কিয়াংসি থেকে আসার সময় একটা ছোটো বালতি নিয়ে এসেছিলাম—তাতে কিছু জল রেখে দিতাম তাঁর হাত মুখ ধোয়ার জন্য—আর কিছু ছিলো না বলে ওটাই তিনি ব্যবহার করতেন। তারপর তাঁর ক্ষিধে পেতো, আমি তখন মগে করে "তিন স্তরের ভাত" এনে দিতাম—অর্থাৎ মগে প্রথমে কিছু ভাত দিয়ে মাঝে দিতাম যা হোক তরিতরকারি যা থাকতো, তার উপরে আবার ভাত দিতাম। বিকেলের খাবারের থেকে ভাত যা বাঁচতো তাই তাঁর জন্য গরম করে রেখে দিতাম। সব খেতে না পারলে এক টুকরো কাগজ দিয়ে ঢেকে তা রেখে দিতেন—পরবর্তী খাবারের সময় খেয়ে নিতেন—খাবার কোনো সময়ই ফেলে দিতে আমাকে দিতেন না। এই খাওয়ার পর

আবার শুরু হতো কাজ। আর এই পরিস্থিতিতেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত **জমির অনুসন্ধান অভিযান প্রসঙ্গে** লেখা বইখানি।

তারপর কিয়াংসির জুইচিনে কেন্দ্রীয় শ্রমিক কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বা চেয়ারম্যান হলেন—তখনও তাঁর সেই সরল জীবনযাত্রাই বহাল রইলো। ফুকিয়েনের চ্যাং চাও-এ প্রবেশ করার আগে ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খাবার রাখার উপযুক্ত একটা পাত্রও আমাদের ছিলো না।

খুবই গরীব পরিবারের সন্তান আমি, লেখাপড়া কিছুই কোনো দিন শিখিনি। বিপ্লবে যোগ দেওয়ার সময় পর্যন্ত একটি বর্ণও লেখাপড়া জানতাম না। লাল ফৌজ যেখানেই যেতো সেখানেই তারা কিছু পোস্টার টাঙিয়ে দিতো—চেয়ারম্যান মাও ঐ সব পোস্টার থেকে আমাকে অভিযান চলা কালেই একটু সময় করে নিয়ে অক্ষরগুলো চিনিয়ে দিতেন। কী করে নাম সই করতে হয় তা তিনিই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

টেলিফোনের শব্দ আমাকে ঐ স্মৃতি-রোমন্থন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখি চেয়ারম্যান মাও তখনও কাজে মগ্ন।

সোনালি বালির নদী পার হতে সেনাবাহিনীর তিন দিন তিন রাত লেগে গেলো। চল্লিশ হাজারের মতো লোক ছিলাম আমরা। ঐ তিন দিন তিন রাত চেয়ারম্যান মাও তার "ডেস্ক" ছেড়েই উঠলেন না।

তারপর আবার যাত্রা শুরু হলো।

ঈ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে গেলাম আমরা, পার হলাম তাতু নদী। ১৯৩৫-এর মে মাসের মধ্যে আমরা হুয়ালিংপিং পৌঁছলাম। রওনা দিলাম হুইতসেতির পথে, ধরে নেওয়া হলো হুয়ালিংপিং থেকে পুরো একদিন তার জন্য লেগে যাবে।

যথারীতি ভোরেই রওনা দেওয়া হলো। কী একটা কাজে আটকে পড়ে কেন্দ্রীয় কমিটির লোকজনের সঙ্গে না গিয়ে মেডিকেল বাহিনীর সঙ্গে চেয়ারম্যান মাও রওনা হলেন। দেহরক্ষীদের দলপতি এবং আমি তাঁর সঙ্গেই চললাম। খোলা মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মাঠটি চার মাইল মতো বিস্তৃত—শত্রুপক্ষের তিনটি বিমান হঠাৎ করে নেমে বোমা বর্ষণ করে গেলো। একেবারে কাছেই পড়লো বোমাগুলো—আমরা ছুটে গেলাম চেয়ারম্যান মাওকে আড়াল করার জন্য।

তিনি তখনই উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং আহত স্কোয়াড-লীডারের ওপর ঝুঁকে রয়েছিলেন। স্কোয়াড-লীডার পেট চেপে ধরে চুপ করে মাটিতে পড়ে রয়েছিলেন। চেয়ারম্যান মাও তাঁর গায়ে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মেডিকেল বাহিনীর অফিসারকে বললেন, "দেখুন না, কিছু করতে পারেন কি না?" তাঁর কণ্ঠে ব্যগ্রতা। আমার দলপতি সকল প্রকার সাহায্যই সরিয়ে দিচ্ছিলেন—বললেন, "আপনারা এগিয়ে চলুন।" তার পক্ষে কথা বলাই কঠিন হয়ে উঠেছিলো। ভীষণ রকম ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিলেন তিনি। যেন কেউ তার সমস্ত রক্ত টেনে নিয়ে গেছে। চেয়ারম্যান মাও তাঁর পাশে বসে মাথা কোলে তুলে নিলেন। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "কমরেড হু চ্যাং পাও, আপনি সেরে উঠবেন। আপনি একটু চুপ করে থাকুন, আপনাকে আমরা সুইতসেতিতে নিয়ে ওখানে ডাক্তার দেখাতে পারবো।" চেয়ারম্যান মাও-এর হাতের ওপর রাখা নিজের মাথাটি নাড়িয়ে স্কোয়াড লীডার বললেন—"আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারি না আপনাদের। আপনারা ও নিয়ে ভাববেন না। আমি বুঝতে পারছি ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাকে নিয়ে ভাববেন না, আমি বেশ আছি। আমার বাবা মাকে খবর দেবেন? কিয়াংশির কিয়ানে তারা থাকেন। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে শেনসিতে আপনাদের সঙ্গে যাওয়া হলো না—ওখানকার আমাদের এলাকাটিও দেখা হলো না।" এই বলে তিনি থামলেন, এক মিনিট জোরে শ্বাস নিলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"চেন চ্যাং-ফেঙ, চেয়ারম্যান মাও ও অন্যান্য নেতাদের ভালো করে যত্ন নিও।" তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল আর যে কী বললেন আমরা শুনতে পেলাম না। আবার কথা বলতে চাইলেন—দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ছে। হঠাৎ অনেক চেষ্টা করে তিনি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলেন "বিপ্লবের জয় হোক!" তাঁর মাথা ঝুলে পড়ল, চক্ষু স্থির হয়ে বুজে এলো। "স্কোয়াড লীডার, স্কোয়াড লীডার" বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে। চেয়ারম্যান মাও তাঁর হাত বের করে নিয়ে এলেন ওর মাথার নিচ থেকে এবং দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "লেপখানি দাও তো!" বিছানা থেকে বের করে লেপখানি তাঁকে দিলাম, চেয়ারম্যান মাও লেপখানি ওর মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দিলেন।

মনে পড়ছে আরেকটা সময়ের কথা; সেপ্টেম্বরের ঐ সময়ে আমরা

লাৎসেকৌ এর কাছাকাছি পৌছেছি—চেয়ারম্যান মাও-এর ঘুমোবার সব ব্যবস্থা করে তাঁর খোঁজ করতে বেরিয়েছি। লিন পিয়াও, নী জুং-চেন, লিউ ইয়া-লোও আর লো জুই-চিং এর সঙ্গে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে তখন তিনি জোর মিটিং করছেন। আমি চুপি চুপি বেরিয়ে এলাম।

পর দিন আমরা লাৎসেকৌ দখল করে নিলাম এবং এগিয়ে চললাম। লিউপান পর্বত পড়েছিলো আমাদের যাত্রার পথে। প্রায় চল্লিশ মাইল দূরের হাতাপু গ্রাম পর্যন্ত একদিনে পৌছে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিলো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সকাল, ঘন মেঘে চারদিক ঢাকা, জোর হাওয়া বইছিলো আর বৃষ্টি শুরু হলো। লিউপান পর্বতের পাদদেশে পৌছতে পৌছতে আমরা জলে ভিজে একাকার হয়ে গেছি।

বিরাট তুষারাবৃত যে পর্বতশ্রেণী আমরা এর মাঝে পেরিয়ে এসেছি সে তুলনায় লিউপান পর্বত্যের মধ্যেই পড়ে না—কিন্তু চড়াই ও উৎরাই মিলে দূরত্বটা ভীষণ বেশি মনে হচ্ছিলো। প্রায় পঁচিশ মাইল পার হয়ে এসেছি—কী কষ্টই না হলো। কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই পাওয়া যাচ্ছিলো না, পাহাড়ের মাথায় গাছপালা কিছুই ছিলো না, খালি শুকনো ঘাস।

ঐ সময়ে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, তাছাড়া তার কিছুদিন আগে সেচুয়ানে আমার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিলো। ফোলাটা কমে এসেছে—তবু কেমন যেন ভারী ভারী লাগছিলো। পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতে না পৌছতে আমার এমন মাথা ঘুরতে লাগলো যে আমার পক্ষে পা চালানো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। চেয়ারম্যান মাও-এর তা নজরে পড়লো—জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী। আমি তাঁকে বললাম যে আমার ভয় হচ্ছে পাহাড় পার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কথা বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। চেয়ারম্যান মাও আমাকে টেনে তুললেন। তিনি ভাবছিলেন হয়তো আমার আবার ম্যালেরিয়া হয়েছে, অন্য একজন দেহরক্ষীকে বললেন চিকিৎসার ভার-প্রাপ্ত আর্দালীকে বলে আমার জন্য কিছু একটা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে। আমার ম্যালেরিয়া হয় নি, পথ চলতে চলতে আমি ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁকে বললাম, "আপনারা এগিয়ে চলুন, আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এসে পড়বো।"

চেয়ারম্যান মাও বললেন, "তা হবে না। হাওয়া এখানে ভীষণ হাল্কা—

তাছাড়া এই বৃষ্টি! এটা জিরোবার জায়গা নয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে পাহাড় থেকে নামতেই হবে।" অন্য একজন দেহরক্ষীর সঙ্গে মিলে তিনি আমাকে বয়ে নিতে চাইলেন। তা আমি হতে দেবো না, তাই চেষ্টা করলাম আবার হেঁটে চলতে, পারলাম না—এক পাও এগোতে পারলাম না। সারা গা কাঁপছিলো। চেযারম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী? ঠাণ্ডা লেগেছে?" আমি বললাম, "তাই মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছি, সব কিছু যেন জমে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।" চেয়ারম্যান মাও বললেন, "এসো, আমার ওভারকোটটা নিয়ে নাও—আর একটু গরম জল খাও। গরম লাগলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি তাঁর ওভারকোটটি খুলতে যাচ্ছিলেন—আমি তাঁর হাত চেপে ধরলাম। চিৎকার করে বললাম, "না, চেয়ারম্যান মাও, তা হয় না; আমি আপনার কোট নিতে পারবো না। এই দেখুন আমি বেশ হাঁটতে পারছি।" আমি জানতাম তাঁর গায়ে যে সাধারণ জামা রয়েছে তাতে শীত আটকাবে না। তাছাডা অনেক রাত অবধি জেগে থাকবেন। পীড়াপীড়ি করে বললাম তাঁর কোট আমি নিতে পারবো না, হাঁটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু হাঁটার শক্তি আমার ছিলো না। এক পা এগোতে চেষ্টা করতেই ধপ করে পড়ে গেলাম লম্বা হয়ে। যখন আমার হুঁশ হলো, দেখি অন্য একজন দেহরক্ষী আমার জন্য গরম জল নিয়ে এসেছেন—আর আমার গায়ে চাপানো রয়েছে চেযারম্যান মাও-এর কোট। তাকিয়ে দেখি কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ওর গায়ে তীরের মতো বিঁধছে—কেমন যেন জোর পেয়ে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর সহজ সরল পিতৃস্নেহের ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ভালো লাগছে?" বললাম, "চমৎকার লাগছে।" চেষ্টা করলাম পায়ে ভর দিয়ে দাঁডাতে। তিনি বললেন, "এই তো হচ্ছে লাল ফৌজের লোকের মতো কথা! চলো, আমরা এগোই।"

পাহাড পেরিয়ে এলাম সন্ধ্যার আগেই আর হাতাপু পৌছানোর আগে উঠলাম একজন কৃষকের বাড়িতে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মন চলে গেলো আবার পাহাডে। ভাবছিলাম, চেয়ারম্যান মাও যদি তাঁর ওভারকোটটি আমাকে না দিতেন, তা হলে ঐ পাহাড়ের মাথায় কোথায় মরে পডে থাকতাম। ভাবতে ভাবতে চোখ জলে ভরে উঠলো!

উকিয়াং পেরোবার সংগ্রাম

এয়ার চীফ মার্শাল লিউ য়া-লো

জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য চীনের শ্রমিক কৃষকদের লালফৌজের যে প্রথম সম্মুখ বাহিনী উত্তর মুখে রওনা দিয়েছিলো, ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে তা' দক্ষিণ-পূর্ব কিউচাও-যে উপস্থিত হলো। পথে শত্রুপক্ষের পরপর চারটি প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিলো তাকে। সেনাপতি লিন পিয়াও আর রাজনৈতিক ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা নিয়ে জুং-চেন প্রথম সম্মুখ বাহিনীর প্রথম সেনাদলের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: "সেনাবাহিনীর বর্তমান রণনীতিগত লক্ষ্য হচ্ছে প্রথমে উত্তর কিউচাও-য়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তারপর আচমকা সুনয়ি আর তাংজে দখল করে নেওয়া এবং জনগণকে সংগঠিত করে জাপানের প্রতিরোধের জন্য নূতন এলাকা গড়ে তোলা।"

সুনয়ি ছিলো কিউচাওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আর তাংজে ঐ অঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুর আস্তানা। কিউচাও-য়ের সব চেয়ে বড়ো নদী উকিয়াং গোটা প্রদেশটাকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। সুনয়ি ও তাংজের দক্ষিণে তা একটি দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে রেখেছিলো। সুনয়ি আর তাংজের মধ্যবর্তী লৌশন-কুয়ান গিরিপথ এমন একটি ভীষণ জায়গা যেখানে "একজন মানুষ দশ হাজার মানুষকে ঠেকিয়ে দিতে পারে।" ঐ দু'টি শহর দখল করার জন্য প্রথমেই দরকার উকিয়াং নদীটি পার হওয়া এবং লৌশানকুয়ান গিরিপথটি দখল করে নেওয়া।

প্রথম সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশনকে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে লাও-হুয়াংপিং দখল করে নেওয়ার পর উকিয়াং নদী পেরোবার এবং সুনয়ি ও তাংজে অধিকার করার ভার দেওয়া হলো। সেনানী ও সৈন্যেরা সকলেই জানতেন এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করা অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য। পার্টির কর্মধারা ও রণনীতিগত কর্মনীতি অনুসরণের অগ্রগতির পথে "প্রকৃতির

প্রতিরোধ" উকিয়াং নদী বা ভীতিপ্রদ লৌশানকুয়ান গিরিপথ কোনো প্রতিবন্ধক বলেই গণ্য হতে পারে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় প্রস্তুত হয়ে আমরা কালবিলম্ব না করে প্রাথমিক অনুসন্ধানমূলক কাজকর্ম ও প্রচার অভিযান শুরু করে দিলাম।

"আচ্ছা বলুন তো, কমরেডরা, কিউইয়াং এখান থেকে কত দূর?"

"একশ আশি লী'র মতো হবে।"

"কিউইয়াং দখল করা কি সহজ হবে?"

"ওয়াং চিয়া-লিয়ের সৈন্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। লালফৌজ নিশ্চয়ই কিউইয়াং দখল করে নিতে পারবে। ওরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।"

"ঠিক আছে, তাহলে কিউইয়াং দখল করতে রওনা হই। কি বলেন, কমরেডরা?"

"ঠিক আছে, কিউইয়াং দখল করতে আমরা এগিয়ে চলি, চলুন, ওয়াংচিয়ালিয়ের শোষণের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে আসি!"

আমাদের কিউইয়াং অভিযানের খবর দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

আমাদের অগ্রগামী বাহিনীটি এগিয়ে চললো উকিয়াং নদীর দিকে। দেড় দিন পরে নদী থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরের হাউ চাং-এ পৌছলাম, ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ডানদিক ধরে এগিয়ে চলা আমাদের প্রথম ডিভিশনের হাতে উচিং-এর কুয়োমিনটাং জেলা সদরের পতন ঘটে এবং ওখান থেকে মার খেয়ে পালিয়ে আসা কুয়োমিনটাং রেজিমেণ্টটি লালফৌজের আগমনের আঁচ পেয়েই চম্পট দিয়েছে। স্থানীয় লোকেরা আমাদের বললেন: "উকিয়াং এক অসম্ভব নদী, ভীষণ খাড়া তার পার, অনেক উঁচু, অনেক গভীর; আর কী দুর্দান্ত স্রোত— স্মরণাতীতকাল থেকে তা একটা প্রাকৃতিক প্রতিরোধ হয়ে রয়েছে। নৌকায় পার হওয়াও অসম্ভব—কারণ অপর পারেই রয়েছে সশস্ত্র জমিদার ওয়াং চিয়ালিয়ের সৈন্যরা।"

সাধারণতঃ বছরের শেষ দিনটি সারা বছরে অর্জিত বিজয়ের উৎসব দিবস এবং পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের পর্যালোচনার দিন হিসাবে পালন করা হতো; ঐদিন লালফৌজ একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করতো। এবার অবস্থাটা

ছিলো আলাদা। সৈন্যরা এবার লং মার্চে লিপ্ত, খানাপিনা ও উৎসব আয়োজন করতে হচ্ছিলো ছোটো ছোটো দলে ও নিতান্ত সাধারণ ভাবে। তাছাড়া এবারে খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ স্ফূর্তির কোনো পরিকল্পনাও নেওয়া হয় নি। পুরো বাহিনীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো আসন্ন যুদ্ধবিগ্রহের দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা উত্তপ্ত অথচ আনন্দময় পরিবেশ সারা বাহিনীতে দেখা গেলো। রণনীতিগত বিষয় নিয়ে কোম্পানীগুলোতে আলোচনা হলো, নানা রিপোর্ট শোনা হলো, নানা আলোচনা হলো। উকিয়াং নদী পেরোবার ব্যাপারে সৈন্যদের বুঝিয়ে বলা হলো।

"উকিয়াং নদী পার হতে হবে!" "স্নুনয়ি ও তাংজে মুক্ত করতে হবে!" "অগ্রগামী সৈন্যদলের দায়িত্ব পালন করতেই হবে!" স্নুনয়ি ও তাংজেতেই এবার নববর্ষ উৎসব পালন করতে হবে!" এ ধরনের সংগ্রামী স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো।

পার্টি শাখাগুলোতে আলোচনার পর এবং সাধারণ সমাবেশে আলোচনার পর সবার মনেই নূতন প্রেরণা ও দ্বিগুণ আস্থা দেখা দিলো।

নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই নদী পার হওয়ার সংগ্রাম শুরু হলো। সম্মুখবর্তী রেজিমেণ্টটি ফেরি পর্যন্ত এগিয়ে গেলো সদল বলে নদী-তীর থেকে পথ তৈরী করে দেওয়ার জন্য। নদীটি প্রায় তিনশ গজ প্রশস্ত, আর প্রতি সেকেণ্ডে জলের গতি ছিল প্রায় দু'গজ। দক্ষিণে নদীর তীর পর্যন্ত পথটি ছিলো দশ লী ঢাল বিশিষ্ট খাড়াই বেয়ে, পাথর ভরা পথ দিয়ে, উত্তর পারেও ওরকম ছিলো দশ লী পাথর ভরা পথ ধরে আগাছায় ভরা উৎরাই—তারপর থেকে স্নুনয়ি ও তাংজেতে যাওয়ার রাস্তা। দুটো পারেই ভীষণ খাড়া উঁচু ভাঙন। নদীর সবুজ জল আর কুচকুচে কালো পাথর ভরা তীর ভূমি সহজেই দেখা যাচ্ছিলো। দক্ষিণ তীরে দেখা যাচ্ছিলো বেশ কিছু ভাঙা পর্ণকুটির, মনে হচ্ছে, শত্রুরা সেগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে যদি আমরা সেগুলো ব্যবহার করি এই ভয় থেকে। আমাদের সামনের ইউনিটগুলো দক্ষিণ পারের মাইল খানেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। উত্তর পারের শত্রু সৈন্যদের সেদিকে খেয়ালই নেই, তারা মনের আনন্দে খোঁড়াখুঁড়ি ও অন্যান্য কাজ কর্ম করে চলেছে। আমাদের অগ্রগামী রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কেং পিয়াও ছদ্মবেশে নদী তীর পর্যন্ত গিয়ে সব দেখে শুনে এলেন। শত্রুরা ফেরীতে প্রহরা বসিয়েছে—

প্রায় পাঁচশ গজ উজানে একটা সরু পথ মূল রাস্তার সঙ্গে ফেরীর সংযোগ সাধন করে রয়েছে। কোনো রকম করে ঐ পথ দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। নদীর দুই তীরেই সমতল কোনো বেলাভূমি নেই। অবতরণ করাটা তাই এক দুরূহ ব্যাপার,—তারপর শত্রুরা একটি দল কাছাকাছি রেখেছে আর নদী-তীর থেকে প্রায় একশ গজ দূরে শক্ত রক্ষা-ব্যূহ রচনা করেছে—ফলে অবস্থাটা খুবই কঠিন। মাইল খানেক দূরে একটা মন্দিরে সাহায্যকারী এক রেজিমেণ্ট সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র জমা রেখেছে এবং প্রায় দু'মাইল দূরে একটা পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় এক রেজিমেণ্টের চেয়েও বেশি সাধারণ সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে।

শত্রুরা যখন টের পেলো যে আমাদের অগ্রসর বাহিনী দক্ষিণ পারের কয়েক শ' গজ দূরে তৈল বীজ পেষাই-এর কারখানা দখল করে নিয়েছে—তারা তখন অন্য পার থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করলো।

চারপাশের অবস্থা ভালো করে খুঁটিয়ে ও সতর্কভাবে বিচার করে অগ্রসর বাহিনীর আফসার, কমাণ্ডার ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা মন স্থির করে ফেললেন। ফেরী পর্যন্ত পথটা যেহেতু শত্রুদের প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং অধিকতর শক্তিশালী সংরক্ষিত অবস্থান থেকে তার প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—ফেরী পথের ওপর একটা নকল আক্রমণ চালানো হবে কিন্তু আমাদের প্রধান আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হবে উজানের দিকের সরু পথটার উপর। প্রায় পাঁচশ গজ দূরের ঐ খাড়াইটা কষ্টেসৃষ্টে পার হওয়া যেতে পারে—শত্রুর নজর ওদিকে কম ছিলো। অন্য সব দিক ছিলো একেবারেই অনতিক্রম্য।

শত্রুদের নজরে পড়তে পারে এ ভাবে তাদের দেখিয়ে সেতু তৈরি করার দ্রব্য সামগ্রী ফেরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। যা ভাবা হয়েছিল তাই হলো, শত্রু রক্ষাব্যূহ জোরদার করতে শুরু করলো আর আমাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়ি করে বাঁশের ভেলা তৈরি করতে লাগলেন এবং একটা সেতু তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। আঠারোজন বাছাইকরা সাঁতারু ঠিক করা হলো, ওরা সাঁতরে নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে শত্রুর প্রহরী দলকে কাবু করে ফেলবেন এবং মূল বাহিনীর নদী পার হওয়াকে আড়াল করে রাখবেন। আমাদের ঐ আঠারোজন সাঁতারু

পূর্বোদ্যমে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হলেন, তৈরি হয়ে নিলেন।

ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মাঝে, বাতাস বরফের মতো হিমে কন কন করছে। শত্রু সৈন্যরা ঝটপট করে তাদের রক্ষাব্যূহে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচাতে লাগলো : "জলদি করো! কমিউনিস্টরা নদী পার হতে শুরু করেছে! সবাই চলে এসো! জলদি করো!" ভীষণ গুলি বর্ষণ শুরু করলো ওরা।

আমাদের মূল আক্রমণকারী বাহিনীর মেশিনগান গুলো গর্জে উঠলো এবং মর্টার ছোঁড়া শুরু হলো। আমাদের সাঁতারু সৈনিকদের প্রথম আটজন পিঠে একটি করে বন্দুক বেঁধে নিয়ে সেই হিমশতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কাটা এই অবস্থায় এক অসম্ভব ব্যাপার। এক টানা গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রায় দশ মিনিটে ওরা আটজন কোনো প্রাণহানি না ঘটিয়ে অপর পারে পৌছে গেলেন, শত্রুরা প্রহরা কেন্দ্রের নীচে নদীর উঁচু পার ঘেঁষে লুকিয়ে রইলো। শত্রুরা চেঁচাচ্ছিল, "হুঁশিয়ার থেকো, লাল সৈন্যরা এসে যাচ্ছে!"

আমাদের সেনাপতি নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবেন ঠিক করলেন। বাঁশের প্রথম ভেলাটি মাঝ নদীতে শত্রু পক্ষের গোলা লেগে উল্টে গেলো। যদিও আমাদের আটজন ওপারে চলে গেছেন, সাহায্য না পাঠালে ওরাও কিছু করতে পারবেন না। তাই ওদের চলে আসতে বলা হলো। সাঁতরে ফিরে আসার পথে একজন কমরেড অসহ্য ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেলেন, সংজ্ঞা হারিয়ে স্রোতে ভেসে গেলেন, বীরের মৃত্যু বরণ করলেন! প্রথম প্রয়াস আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেলো।

প্রথম ব্যর্থতা সত্ত্বেও সৈন্য ও সেনাপতি কেউই বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি আমরা; বরং কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের জেদ বেড়েই গেলো। নানান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলো। যতো অসুবিধাই থাক, ক্ষয় ক্ষতি যা-ই হোক আমাদের সেনাদলকে নদী পার হতেই হবে। অবস্থা পর্যালোচনা করে, অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঠিক করা হলো রাতের অন্ধকারেই নদী পার হতে হবে; তাতে শত্রুর গোলাগুলি এড়ানো যাবে আর ক্ষয়ক্ষতিও কম হবে। ভেলা নির্মাণকারীরা দোতালা ভেলা তৈরী করতে লেগে গেলেন, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জোর রাজনৈতিক প্রচারকার্য শুরু করা হলো।

সূর্য ডুবে যেতেই চতুর্থ রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নকে নদী তীরে জড়ো

করা হলো ; ওদেরই নদী পেরোবার প্রথম ভার ছিলো। চারদিকে সব চুপচাপ, শুধু নদীর কলকল, ছলছল শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। শত্রুরা মাঝে মাঝে গোলাগুলি ছুড়ছিলো। ভেলার দড়ি খুলে দেওয়া হলো, প্রথম কোম্পানীর পাঁচজন তাতে চড়ে বসলেন। ঠিক হলো নদী পার হয়ে তাঁরা তাঁদের টর্চ জ্বালিয়ে ইঙ্গিত জানাবেন। এইভাবে যখন পুরো এক প্ল্যাটুন নদী পার হয়ে যাবে তখনই শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা শুরু করা হবে।

শত্রুদের অলক্ষিতভাবে প্রথম ভেলাটি চুপিচুপি রওনা দিলো। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শত্রুপক্ষের দু' একটা গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। আমাদের তৃতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডার মাও চেং-হুয়া, একজন বার্তাবাহক, তিনজন মেশিনগানচালক একটি মেশিনগান ও কার্বাইন নিয়ে দ্বিতীয় ভেলায় চেপে রওনা দিলেন। দ্বিতীয় ভেলা পৌছার ইঙ্গিত পেয়ে রওনা হওয়ার জন্ম তৃতীয় ও চতুর্থ ভেলার যাত্রীরা প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেলো তবু প্রথম ভেলার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেলো না যে তারা পৌছেছেন। ব্যাপারটা না বোঝা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ ভেলা থামিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

ঘণ্টা খানেক পরে প্রথম ভেলার পাঁচজন সৈন্য আমাদের পার বেয়েই ফিরে এলেন। বললেন : স্রোতের টানে তাদের ভেলা ভাঁটির দিকে চলে যাচ্ছিলো, অন্ধকারে তাঁরাও কিছু টের পাচ্ছিলেন না। অবশেষে প্রায় এক মাইল দূরে দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে ভেলাটি পৌছালো, তারপর অন্ধকারে বনবাদাড় ভেঙে তারা এসে পৌছেছেন। তাঁদের এই অভিজ্ঞতার পর বোঝা যাচ্ছিলো না দ্বিতীয় ভেলাটি সোজা অপর পারে পৌছেছে না ওদের মতোই ভেসে গেছে ভাঁটির দিকে। যাই হোক আরেকটা চেষ্টা তো করতেই হয়। তৃতীয় ভেলাটি মাঝ-নদী পর্যন্ত গিয়ে বাধ্য হযে ফিরে এলো। এযাবৎ দ্বিতীয় ভেলার যাত্রী কোম্পানী কমাণ্ডার ও তাঁর সঙ্গীদের কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছিলো না। নদী পেরোনো আবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

তবু কেউ আমরা দমে যাইনি। একটা পথ খুঁজে বের করার জন্ম সবাই ভাবতে লাগলেন। পরে ঠিক হলো দিনের বেলাতেই পার হতে হবে,—তাতে বরং ঝঞ্ঝাট অনেক কম হবে।

এই দু'দিনের গণ্ডগোলের খবর পেয়ে শত্রুপক্ষ নূতন সৈন্য জড়ো করেছে।

অপর পারে তাদের তাঁবু সংখ্যায় বেড়ে যেতে লাগলো। তাদের মর্টার ও গোলাগুলি ছোঁড়াও বেড়ে যেতে লাগলো। রক্ষণাত্মক কাজকর্ম জোরে-সোরে তারা চালাতে লাগলো।

তৃতীয় দিনে আবার নদী পেরোনোর চেষ্টা শুরু হলো। ফেরিতে একটি ছোটো দল নকল হামলা শুরু করলো। প্রায় পাঁচশ গজ উজানে গোলাগুলির আড়াল দিয়ে তিনখানি ভেলায় করে ডজন খানেক সৈন্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপর পারের দিকে রওনা দিলেন। আমাদের গোলাবর্ষণের জন্য শত্রুরা সঠিকভাকে তাক করে গুলি ছুড়তে পারছিলো না। তিনটি ভেলার কোনো সৈনিকই আহত হন নি। একটা ভেলার মাস্তুলে তিনবার শত্রুদের গুলি লাগলো—কিন্তু মাস্তুলটি বেজায় শক্ত ছিলো বলে বিশেষ ক্ষতি হলো না। গোলাগুলি ছোড়া যখন চরমে উঠেছে—ভেলা তিনটি তখন প্রায় অপর পারে পেঁাছে গেছে। দ্বিতীয় দল যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে নিলো।

বেসামাল হয়ে শত্রুরা প্রাণ ভয়ে গোলাগুলি ছুড়ে চলছিলো—হঠাৎ তাদের নীচ থেকে ক'জন লোক বেরিয়ে এলো। শত্রুদের নজর তখন ভেলা তিনটির দিকে। এদিকে ওদের সেনট্রিবক্সের নীচেই যে আবার ক'জন লোক বসে রয়েছে তা তারা ভাবতেও পারে নি। হঠাৎ একেবারে কাছে থেকে শত্রুদের লক্ষ্য করে মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। শত্রুপক্ষ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো তাদের। খাড়াই-এর নীচ থেকে বেরিয়ে এসে ঐ লোকেরা শত্রুর শান্ত্রীর অবস্থানটি দখল করে নিলেন এবং তিনটি ভেলায় করে আমাদের ক্ষুদ্র দলটির অবতরণ সম্ভবপর করে তুললেন।

এদিকে এপারে বসে আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না—"ঐ লোকেরা কারা ?" পাশে থেকে কমাণ্ডাররা বলে উঠলেন, "ওরা কোম্পানী কমাণ্ডার মাও এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ছাড়া আর কেউ নন। শ্বেত রক্ষীদের কপাল মন্দ, আমাদের লোকেরা ওপারে পৌছে গেছেন !" চারদিকে লালফৌজের সৈন্যরা আনন্দধ্বনি করে উঠলেন।

যুদ্ধ চলতে লাগলো আর আমাদের সৈন্যেরা দলে দলে নদী পার হতে লাগলেন। এই অবসরে কোম্পানী কমাণ্ডার মাও এবং সঙ্গী সাথীরা শত্রুদের

একেবারে সঙ্গীনের ডগার মুখে কী করে সারাটা রাত কাটালেন সেই কাহিনীটা শুনে নেওয়া যাক!

রাতের অন্ধকারে দ্বিতীয় ভেলায় করে কোম্পানী কমাণ্ডার মাও রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁর চারজন সঙ্গীকে নিয়ে। যা হোক করে অপর পারে পেঁাছেও গেলেন। কিন্তু ওখানে পেঁাছে যাবার পর আর কেউ এলেন না। যেহেতু তাঁরা একেবারে শত্রুর প্রায় কুড়ি গজের মধ্যে ছিলেন, তাই টর্চ না জ্বালিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তাঁরা সংকেত জানালেন; কিন্তু অপর পারের কেউ তা দেখতেই পান নি।

তাঁরা অবশ্য শত্রুদের কথাবার্তা শুনতে পারছিলেন। "কাজকর্ম রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে! লালসৈন্যরা নিশ্চয়ই কাল আবার নদী পেরোবার চেষ্টা করবে। দেয়ালগুলো আরো পুরু করতে হবে,—লাল-ফৌজের গোলার দাপট সত্যিই জবর জোরদার।" শত্রুদের প্ল্যাটুন লীডার পরিদর্শনে এসে জিজ্ঞেস করল—"স্কোয়াড লীডার, কাজকর্ম সব শেষ হয়েছে কি? ভালো করে খেয়াল রাখবেন। ওরা রাতেও পার হতেচেষ্টা করতে পারে।"

কোম্পানী কমাণ্ডার মাও এঁরা ছিলেন মাত্র পঁাচটি মানুষ। কোনো সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও তঁাদের ছিলো না। তাই সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিলোনা তাঁদের। সঙ্গীদের একজন অধৈর্য হয়ে কানে কানে মাওকে বললেন, "কমাণ্ডার, ওরা যদি না আসেন?"

মাও দৃঢ়ভাবে বললেন, "ভেবো না, ওরা ঠিক আসবেই। যদি আজ রাতে নাও আসে কাল তঁারা আসবেই। যদি তারা নাও আসে আমরা চুপ করে লুকিয়ে থাকবো। কি আসে যায় তাতে? পথ একটা হবেই। ঘাবড়িয়ো না।"

শোনা গেলো শত্রু সৈন্যরা বলাবলি করছে, "লালফৌজের লোকগুলোর কি রকম সাহস দেখলে তো! হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও নদীটি সঁাতরে পার হতে ওদের একটু ভয় হলো না। ভাগ্যিস, মাত্র আটজন এসেছিলো বেশী এলে যে কী হতো তা তো জানাই আছে। ··প্ল্যাটুন কমাণ্ডার বলে গেলেন ওরা না কি অগ্রসর দলটি মাত্র। ওদের পুরো বাহিনীটি যখন আসবে তখন তো ভীষণ দায় হবে আমাদের।"

আমাদের একজন কমরেড কোম্পানী কমাণ্ডারকে বললেন—"চলুন কমরেড,

বেটাদের শেষ করে দেওয়া যাক। আমার মনে হচ্ছে ওদের কাবু করে ফেলা খুব কঠিন কাজ হবে না।" কমাণ্ডার মাও তাকে থামালেন। "আমরা কাবু করে ফেলতে পারবো ঠিকই, কিন্তু তাতেই তো আর বাজী মাৎ হয়ে যাবে না। মাঝখান থেকে আমাদের মতলবটা ফাঁস হয়ে যাবে।"

ওঁরা পাঁচজন গাদাগাদি করে রাত কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। বাইরে কনকনে শীত, বাতাস বইছে সাঁ সাঁ করে, ওরা তবু দমলেন না। ঝিম ধরে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আবার যুদ্ধের ব্যাপারে চলে আসা যাক। তিনটা ভেলায় করে ঐ বারো জন সৈন্য, কমাণ্ডার মাও-এর দলে এসে যোগ দিলেন এবং শত্রুর সান্ত্রী পোস্টটি দখল করে নিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত শত্রুপক্ষের প্ল্যাটুনের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম হাত বোমা বর্ষণ করা শুরু হলো, মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ওরা বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে চললেন। শত্রুর শিবিরটি দখল করে নেওয়া হলো, প্ল্যাটুনের অর্ধেক হতাহত হলো, বাকীরা পালিয়ে গেলো। আমাদের সৈন্যরা যখন লড়াই করে এগিয়ে চলছিল একটি খাড়া পাহাড় বেয়ে, শত্রুপক্ষের সংরক্ষিত বাহিনী এসে পৌঁছে গেলো। শত্রুপক্ষের তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য এখন, শত্রুর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য উঁচু একটা পাহাড়ে বসে আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদের এগিয়ে চলার পথকে ঠেকিয়ে রেখেছিলো। একমাত্র যে সরু পথটা রয়েছে তাই ওদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের এপার থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করে শত্রুপক্ষের আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিলো। যখনই ওরা নেমে আসার চেষ্টা করেছে আমাদের ভারী মেশিনগান ও বিমান বিধ্বংসী প্ল্যাটুন-কমাণ্ডার তাদের দফারফা করে দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে ডানদিক দিয়ে এই আক্রমণে মদত জোগাবার জন্য আমাদের বাহিনীর পক্ষ থেকে বাঁশের ভেলা করে নদী পেরোবার জন্য যাত্রা শুরু হলো।

আমাদের পুরো এক প্ল্যাটুন সৈন্য নদী পেরিয়ে গেলো। পার্টির শাখা-সম্পাদক, রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যুরোর বিশেষ উপদেষ্টাও ফ্রণ্টের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভার গ্রহণের জন্য নদী পার হয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন প্রথম ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার। আমাদের প্ল্যাটুন শত্রুকে আক্রমণ করে তাদের খানিকটা হটিয়ে দিলেন। আমাদের সৈন্যরা আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু পাহাড়টা অনেক উঁচু বলে এবং পথটা অনেক সরু বলে আমাদের সৈন্যরা ব্যূহ রচনা করে এগোতে পারছিলেন না এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় এসে তারা থেমে যেতে বাধ্য হলেন। শত্রুরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো। শত্রুদের আক্রমণে আমাদের অগ্রসর বাহিনীর প্রচুর হতাহত হলো এবং পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো। শত্রু আমাদের আরো পিছনে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা বললেন: "কমরেডগণ, পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। পেছনেই নদী; পেছোনোর অর্থ হচ্ছে মৃত্যু!"

নূতন একটা স্কোয়াড পেছন থেকে এসে আমাদের সঙ্গে শামিল হলো। সবাই মিলে শত্রুকে ঠেকিয়ে দিতে পারলাম। ফলে দাঁড়ালো এক অচলাবস্থা। রাস্তা ছোটো; আমরাও উঠতে পারছি না, ওরাও নামতে পারছে না!

রাস্তাটা ছোটো ও সরু; তাই যুদ্ধটা পুরোপুরি জমে উঠতে পারছিলো না। আমাদের সৈন্যরা অনবরত নদী পার হয়ে আসছিলো। এই অচলাবস্থা চলার সময়টাতে আমাদের প্রথম ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার দেখতে পেলেন বাঁ দিকে একটা খাড়াই রয়েছে চেষ্টা করে তা বেয়ে ওঠা যেতে পারে। একটা দলকে পাঠানো হলো চেষ্টা করে দেখতে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পর ওরা দেখলেন একটা দিক দিয়ে বেয়ে ওঠা যেতে পারে। দলটি তাড়াতাড়ি তার মাথায় চড়ে বসলেন একেবারে শত্রুর ফ্রণ্টের মুখোমুখী হয়ে। আমাদের দলটির প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে শত্রুরা দাঁড়াতে পারলো না। তখন আমাদের মূলবাহিনী আক্রমণ শুরু করলো—শত্রুরা পিছু হঠতে শুরু করলো। এর মাঝে আমাদের পুরো একটা কোম্পানী নদী পার হয়ে চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শত্রুর পুরো মূল ঘাঁটিটি দখল করে নিলাম। ফেরী পথের শত্রু সৈন্যরা বিউগলের ধ্বনি, যুদ্ধের চিৎকার, হাতবোমা ও গোলাগুলির বিস্ফোরণের শব্দ শুনে বুঝতে পারছিলো যে ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়, ওরা একেবারে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। আমাদের অগ্রগামী বাহিনী তখন সারা ফ্রন্ট জুড়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো।

প্রকৃতির দুরতিক্রম্য প্রতিরোধ উকিয়াং নদীর এই প্রতিবন্ধ একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো। যে বাইশজন সৈন্য প্রথমে নদী পার হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁদের নাম দেওয়া হলো "বাইশজন লাল বীর!"

পরাজিত শত্রুরা তখন প্রাণ হাতে নিয়ে চুচাঙ-এর দিকে পালিয়ে গেলো।

চুচাঙ থেকেই সুনয়ি ও তাংজে যেতে হয়। আমাদের অগ্রসর বাহিনী সহায়ক বাহিনীর জন্য অপেক্ষা না করেই শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো। শত্রুদের তিনটা রেজিমেন্ট তখন আতঙ্কে ছুটে পালাচ্ছে। শত্রুদের একজন কোম্পানী-কমাণ্ডার আহত হয়ে পড়েছিলেন, আমাদের সৈন্যরা তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথেই বেচারা মরে গেলেন।

নদী থেকে চুচাঙ চল্লিশ লী দূর, ওখানে ছিলো শত্রুর "নদী রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর।" শত্রুপক্ষের কমাণ্ডার নদীতীর থেকে তাড়াতাড়ি করে এসে পলায়নপর তিনটি রেজিমেন্টের সঙ্গে সুনয়ি চলে গেছেন, সমস্ত দলিলপত্র আর তারবার্তাগুলো ফেলে রেখেই তিনি চম্পট দিয়েছেন। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমাদের বাহিনীটি চুচাং দখল করে নিলো। স্থানীয় লোকজনেরা আমাদের সৈন্যদের বললেন—শত্রুসৈন্যরা একথা কবুল করে গেছে: "লালফৌজের লোকেরা মরণকে ভয় করে না, উকিয়াং-এর মতো নদীও তারা অতিক্রম করে তবে ছেড়েছে!"

আমাদের স্থনয়ি জয়ের কাহিনী

মেজর জেনারেল ওয়াং চি-চেঙ

১৯৩৫ সালের তৃতীয় দিনে ভোরের আগেই আমাদের ডিভিশনের পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড লিউ য়া-লৌ এর কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম : "আমাদের চতুর্থ রেজিমেণ্ট উকিয়াং-এর কুয়োমিনটাং প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয়ে ফেরীঘাটটি দখল করে নিয়েছে। ষষ্ঠ রেজিমেণ্টকে এখনই নদী পার করে নিয়ে যান, যতো তাড়াতাড়ি পারেন স্থনয়ির দিকে এগিয়ে চলুন এবং তা দখল করে নিন !"

কিউচাও-এর গুরুত্বপূর্ণ শহর স্থনয়ি দখল করার ভার আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে শুনে আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। অন্ধকারের মধ্যেই আমরা কালবিলম্ব না করে রওয়ানা দিলাম। উকিয়াং নদীতে কী প্রচণ্ড স্রোত আর মারাত্মক ঘূর্ণী ঢেউ—বাঁশের ভেলায় করে পার হতে হতে মনে হচ্ছিলো যেন জিন-না-আঁটা একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছি যে কোনো মুহূর্তে তা আমাদের ছুড়ে ফেলে দেবে ! যদিও আমাদের ভেলাগুলো বেশ জোরেই চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো—তবু মনে হচ্ছিলো আরো জোরে চললেই ভালো হতো—তাড়াতাড়ি নদী পেরিয়ে ছুটে চলার জন্য আমরা তখন অধীর !

ভোর হয়েছে ; সবাই নদী পেরোবার পর আমরা সোজা রওয়ানা হলাম স্থনয়ির পথে। আমাদের রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার চু শুই-চিউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন—ঘোড়ার ঘাড়ে ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করা একখানি হাতে আঁকা ম্যাপ,—যেতে যেতে তা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। আমিও পাশে পাশে একটা ঘোড়ায় চড়ে চলেছি—ম্যাপটির দিকে তাকাচ্ছি আর স্থনয়ি অভিযানের ব্যাপারে ভাবছি, কী কৌশল নেবো ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেরা কথাবার্তা বলছি। ঐ সময়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে কাজ করার অভ্যাস করে নিয়েছিলাম আমরা।

ভালো করে ভেবে চিন্তে ঠিক করা হলো আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয়

ব্যাটেলিয়নকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে সুনয়িতে হঠাৎ আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠানো হবে। তৃতীয় ব্যাটালিয়নকে দূরে অপেক্ষা করতে বলা হবে জরুরী কোনো প্রয়োজনের জন্য।

সুনয়ি থেকে উনিশ লী অর্থাৎ মাইল ছয় দূরে তুষানসি নামে ছোটো একটা শহরে আমরা রাত কাটালাম।

পরের দিন (৪ঠা জানুয়ারী) অন্ধকার থাকতেই আমরা উঠে পড়লাম। প্রহরীরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের জানালো সদরদপ্তর থেকে চীফ-অফ-স্টাফ কমরেড লিউ পো-চেঙ এসে পৌছেছেন।

আমরা সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলাম—"এবার নির্ভর করার মতো একজনকে পাওয়া গেলো।" রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আর আমি যা হোক করে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। উনি গেলেন লোকজনকে জড়ো করতে আর আমি চললাম চীফ-অফ-স্টাফের সঙ্গে দেখা করতে।

কমরেড লিউ পো-চেঙও তখন হাত মুখ ধুচ্ছেন দেখতে পেলাম। আমি শুনেছি সারা রাত ধরে তিনি ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম তাঁর হয়নি—তবু তাঁর মুখে চোখে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি লক্ষ্য করলাম না, শুধু মনে হলো প্রচুর পরিশ্রমে একটু শুকিয়ে গেছেন। দেখে তবু তাঁকে বেশ সুস্থ সবলই মনে হচ্ছিলো।

দেখেই বলে উঠলেন, "কেমন আছো পলিটিক্যাল কমিশার? সুনয়ি দখল করতে পারবে ভাবছো?"

আমি বললাম,—"এতে কোনো সন্দেহই নেই। আমরা ভালো করে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখেছি। ওয়াং চিযা-লিয়ের সৈন্যদের সঙ্গে এতো আমাদের প্রথম লড়াই নয়। সুনয়ি দখল আমরা করে নেবোই।" তাঁকে সবিস্তারে আমাদের অভিযানের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললাম। একটু ভেবে নিয়ে মাথা নেড়ে তাঁর সম্মতি জানালেন।

"সৈন্যরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—তাই না? হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসছেন,—চার পাঁচটা প্রদেশ পেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁদের, গত তিন মাস ধরে কতো যুদ্ধই তাঁদের করতে হয়েছে!" তাঁর কণ্ঠে দরদভরা জিজ্ঞাসা।

"হ্যাঁ, লোকজনেরা খানিকটা ক্লান্ত তো বটেই,"—আমি বললাম, "কিন্তু

কুয়োমিনটাং বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হবে শুনে তাঁদের সকল ক্লান্তিই দূর হয়ে গেছে—তাঁরা একেবারে প্রস্তুত।"

চীফ-অফ-স্টাফ একটু হাসলেন, জিজ্ঞেস করলেন,—"গোলা-গুলির খবর কী?"

বললাম: "গোলা-গুলি প্রচুরই রয়েছে। যতো যুদ্ধ হচ্ছে গোলা-গুলি ততোই বাড়ছে। সুনয়ি দখল করার পর নিশ্চয়ই আরো বেশ কিছু গোলা-গুলি পাওয়া যাবে।"

মাথা নেড়ে সহাস্যে সম্মতি জানালেন—কিন্তু মনে হলো অন্য কী একটা নিয়ে তিনি ভাবছেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "সুনয়ি দখল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তোমরাই হলে মূল বাহিনী, সারা পথ ধরে তোমরা চমৎকার যুদ্ধ চালিয়ে আসছো। আমার বিশ্বাস আসন্ন যুদ্ধেও তোমরা আরো বড়ো রকম জয় অর্জন করবে। এটা ঠিক এখানে আমরা ওয়াং চিয়া-লিয়ের আঞ্চলিক একটা বাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়ছি—কিন্তু সুনয়ি বেশ বড়ো শহর—এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বেশ জোরদার। সৈন্য সংখ্যা ওখানে তিন-হাজারের কম নয়, আমাদের সৈন্য খুব জোর এক হাজারের সামান্য বেশি। দেখতেই পাচ্ছো অসুবিধা কতো। যুদ্ধের সময় একটু হিসাবী হওয়াই ভালো। শত্রুকে ছোটো করে দেখো না। মাখনের মতো নরম বস্তুকেও শক্ত পাথর মনে করে প্রস্তুত হওয়াটাই ভালো!"

চুপ করে তাঁর কথা শুনছিলাম। প্রত্যেকটি কথা মেপে মেপে তিনি জোর দিয়ে বলে চললেন, "অবস্থা আমাদের এখনো বেশ শক্ত। শুধু ভালো করে লড়লেই আমাদের চলবে না, গোলা-গুলি যতো কম সম্ভব খরচ করতে হবে, ক্ষয়ক্ষতি যতো কম হয় ততোই মঙ্গল। তার অর্থ হচ্ছে মাথা আর বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে।"

সৈনাধ্যক্ষের কথাগুলো মনে মনে বারবার ভেবে দেখছিলাম। মনে হলো যেন তা' আমার কথার দুর্বল দিকগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিচ্ছে। আমি দৃঢ়প্রত্যয়ের সুরে বলে উঠলাম: "ভাববেন না চীফ-অফ-স্টাফ, সুনয়ি যেমন করে হোক দখল আমরা করবোই। আপনি কি সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলবেন?"

চশমা চোখে দিতে দিতে বললেন, "খুব ভালো কথা বলেছো। চলো

তোমাদের সঙ্গে আজ একসাথেই স্থনয় যাওয়া যাক।"

ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম—আমরা কী করে চীফ-অফ-স্টাফকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে দিতে পারি? তাঁর ওপর অনেক গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়া কতোদিন যে ঘুমোতে পারেন নি কে জানে। কী বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু চীফ-অফ-স্টাফ স্বয়ং যখন চলে এসেছেন তাতে আমাদের সকলেরই বল ভরসা অনেক বেড়ে গেছে।

আমাদের সৈন্যরা যেখানে জড়ো হয়েছেন সেখানে যখন তাঁকে নিয়ে গেলাম তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে। আকাশ জুড়ে ঘন কুয়াসার আস্তরণ, পুঞ্জীভূত মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তা যেন ঘনতর হয়ে উঠেছে। সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চারদিকে তাকিয়ে নিলেন তিনি, তারপর তাঁর স্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হলো:

"কমরেডগণ, অন্যদের অনুসরণ-যোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আপনারা। আপনারা দ্রুতগতিতে অভিযান চালিয়ে এসেছেন, সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করে চলেছেন। সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে দৃঢভাবে এগিয়ে চলেছেন আপনারা। এখন আমরা আপনাদের হাতে ভার দিয়েছি স্থনয়ি দখল করার। আমার বিশ্বাস আছে আপনারা আরো একটি মহান বিজয় অর্জন করতে চলেছেন এবং এভাবে আমাদের লালফৌজের অগ্রগতির পথকে আপনারা নিষ্কণ্টক করে তুলবেন যাতে আমাদের ফৌজ উত্তর মুখে এগিয়ে গিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে।"

তাঁর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ও জয়ধ্বনিতে চারদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুললেন আমাদের সৈন্যরা। মনে হলো একসাথে শত শত বন্দুক যেন গর্জন করে উঠলো, আর সেই তোপধ্বনির মুখে স্থনয়ির শত্রুসৈন্যরা খড়কুটোর মতো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো।

দু'সারি করে আমরা শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। বিকালে আমাদের স্কাউটরা খবর নিয়ে এলো প্রায় ত্রিশ লী দূরে একটা গ্রামে তারা একটা শত্রুশিবির দেখতে পেয়েছে আর ঐ শিবিরে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন শত্রুসৈন্য রয়েছে। এই খবর পেয়েই আমাদের রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার চু সৈন্যদের দ্রুত এগিয়ে চলার নির্দেশ দিলেন এবং অতর্কিতে ওদের অবরোধ করার আদেশ দিলেন। সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে গ্রামের দিকে আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে

চললো। চীফ-অফ-স্টাফ আমাদের সৈন্যদের পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন—শত্রুদের পুরো ব্যাটালিয়নকে কাবু করে ফেলতে হবে যাতে একটি প্রাণীও পালিয়ে গিয়ে ওদের সৈন্যদলকে সতর্ক করে দিতে না পারে এবং আমাদের গোটা অভিযানটাকেই পণ্ড করে দিতে না পারে।

ঠিক তিনটার পর আমরা গ্রামটির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান শুরু করলাম। প্রচণ্ড এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আমরা সবাই ভিজে একেবারে একাকার হয়ে গেছি, কিন্তু কেউই তাতে দমে যায়নি—এসব আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের হলো চূড়ান্ত দুর্দশা। প্রথমতঃ উকিয়াং এর প্রাকৃতিক প্রতিরোধের ওপর ওরা বড়ো বেশী ভরসা করেছিলো, ভেবেছিলো আমাদের পক্ষে ঐ নদী পার হওয়াই সম্ভব হবে না, তাছাড়া এরকম অসহ্য ঝড়বৃষ্টির দিনে আচমকা একটা কিছু অঘটন ঘটবে না এই ভ্রান্তি তাদের একেবারে পেয়ে বসেছিলো। যখন চারদিক থেকে বন্দুকের ও গোলাগুলির ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু হলো তখন বলা যায় তাদের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হলো। কী যে ঘটছে তা আন্দাজ করে অস্ত্রপাতি হাতে নিতে না নিতেই আর প্রতিরোধ রচনা করতে না করতে তারা টের পেলো ইঁদুরের মতো ফাঁদে আটকে পড়েছে তারা।

দেখতে দেখতে আমাদের লোকজনেরা হুড়মুড় করে গ্রামে ঢুকে পড়লো এবং শত্রু সৈন্যদলের দফারফা করে দিলো! শত্রুদলের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ক'জন লোককে নিয়ে সরে পড়ার তাল খুঁজছিলো—অন্ধের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। কিন্তু কোনো ফল হলো না, আমাদের সুসজ্জিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। আমাদের চীফ-অফ-স্টাফের নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম: গ্রামের সমস্ত শত্রু সৈন্যই হয় মারা পড়লো, না হয় বন্দী হলো। দুর্ভাগ্য বশতঃ শত্রুপক্ষের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মরিয়া হয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো—কিন্তু পালানোর চেষ্টা করে বেচারা মারা পড়লো—খানিকক্ষণ আগেই বেচারাকে ইহলীলা সংবরণ করতে হলো। আমরা তাকে বন্দী করে শহরে শত্রুসৈন্যদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর জেনে নিতে চেষ্টা করতাম!

মনে হলো, সুনয়িতে অবস্থানকারী শত্রুদের অবস্থা যেন আমরা খানিকটা আঁচ করে নিলাম, বা বলা চলে, শত্রুরাই আমাদের অবস্থাটা আঁচ করে নিতে পারলো। বন্দীদের মধ্য থেকে আমরা একজন কোম্পানী কমাণ্ডার, একজন

প্ল্যাটুন লীডার এবং জন বারো সৈন্যকে বেছে নিলাম—এরা সবাই গরীব ঘরের সন্তান এবং খুঁটিযে খুঁটিযে এদেব কাছ থেকে মুনযিতে শত্রুবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিতে পাবলাম।

আমি তাদেব নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলাম, কোথায তাদের জন্ম, তাদের পরিবার কোথায বযেছে এসব দিযে শুরু করলাম। ওরা ভীষণ রকম ভয পেযে গেছে, এক এক করে দাঁড়াচ্ছিলো ভযে কাঠ হযে, সোজা হযে খুবই সম্ভ্রম সহকারে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো। বেচারী কোম্পানী কমাণ্ডার তার আগের হম্বিতম্বিব ভাব ছেড়ে একেবাবে মিইযে পড়েছিলো, যখন আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো, সাহস কবে মুখটা আমার দিকে তুলতে পর্যন্ত সে ভরসা পাচ্ছিলো না।

বুঝলাম ওদেব ভয কাটেনি, সন্দেহও ঘুচেনি। আমি যুদ্ধবন্দীদেব প্রতি আমাদের নীতি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম। বললাম আমাদের লালফৌজ শ্রমিক ও কৃষকদেরই সন্তান, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে দেওয়া যাতে গরীব মানুষেরা ভালোভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারেন। আমাদের সম্বন্ধে ওরা কতো কম জানে এটা বুঝলাম, তাই ধনী ও গরীবদের মধ্যে কেনো সমতা নেই এবং কেনোই বা আমরা সশস্ত্র সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে দিতে চাই তা বুঝিযে বলতে শুরু করলাম। সব শেষে বললাম: "এখন কথাগুলো ভেবে দেখো আর আমাকে বলো—সৈন্যদলে যোগ দিযেছো কেনো? তাতে কার লাভ হচ্ছে?"

সব দেখে শুনে মনে হলো আমার কথা ওদেব মনে ধরেছে, দেখলাম ক'জনের চোখ জলে ভরে উঠেছে, অন্যরা মাথা নীচু করে রযেছে। তাদেব একজন বললো: "দেখুন, আমবা গরীবেব ছেলে, সৈন্যদলে নাম লিখিযেছি উপোসে মরছিলাম বলে।" অন্য দু'জন তাদের টুপি খুলে নিলো তাতে কুযোমিনটাং প্রতীক লাগানো রযেছে, টুপিগুলো মাটিতে ছুড়ে পা দিযে মাড়িযে দিলো, চীৎকার করে গাল দিযে উঠলো রাগ করে: "বেটারা আমাদের ঠকিযেছে, আমরা আর সশস্ত্র সামন্তপ্রভু আর জমিদাবদেব জন্য মরতে যাচ্ছি না!"

যখন বুঝলাম ওরা আমাদের কথার আসল অর্থ বুঝতে শুরু করেছে, তখন

বললাম আমরা ঐদিনই স্থনয়ি আক্রমণ করতে চলেছি এবং কেউ যদি শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি আমাদের জানাতে পারে তবে তাকে আমরা যথোচিত পুরস্কার দেবো। একথা শুনে কোম্পানী কমাণ্ডার সোজা হয়ে দাঁড়িযে আমার দিকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিযে বললো, "স্যার, লালফৌজ আমাদের প্রতি খুবই ভালো ব্যবহার করেছে, আমাদের একটা স্থযোগ দিন যাতে আপনাদের সাহায্য করতে পারি!" এ কথা বলে সে সবিস্তারে স্থনয়িতে শত্রুদের প্রতিরক্ষার অবস্থান সম্পর্কে বলতে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ম্যাপ এঁকে আমাদের বুঝিযে দিতে লাগলো। স্থনয়ির গ্যারিসনে কতো সৈন্য রয়েছে তার সঠিক হিসাবও সে আমাকে দিলো।

অর্ধভরা চোখ মেলে তার দিকে তাকিযে জিজ্ঞেস করলাম: "তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি তো?"

কোম্পানী কমাণ্ডার তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো: "প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করতে পারেন। যদি একটি কথাও মিথ্যা হয় তবে আমার মাথা কেটে নিতে পারেন!" অন্যান্য বন্দীরাও মনে হলো এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছে, তারা মাথা নেড়ে তাদের কোম্পানী কমাণ্ডারের বক্তব্যের প্রতি সায় জানালো।

কথাবার্তা শেষ হযে যাওয়ার পর তাদের সবাইকে তিন তিনটি করে রূপোর ডলার দিলাম। ঐ সময় আমাদের খুবই টানাটানি চলছিল—বাঁচানোর মতো টাকাকড়ি কমই ছিলো। কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সর্ব অবস্থাতেই আমরা যথোচিত ব্যবহার সর্বাগ্রে করে থাকি। রৌপ্যমুদ্রাগুলো হাতে নিযে বন্দীরা তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ গোপন রাখতে পারলো না। তারা বললো, "আমাদের অফিসাররা বলেছিলো আপনারা অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক, লালমুখো নীল চোখ শয়তানলোক হিসাবে আপনাদেরই পেশা হচ্ছে খুন জখম ও লুটতরাজ করা এবং মানুষের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া। তারা আমাদের ভয় দেখাতো যে একবার যদি আপনাদের হাতে পড়েছি তো আমাদের দফারফা হয়ে যাবে, আমাদের চোখ উপড়ে, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেবেন! আমরা ভাবতেই পারিনি যে আপনারা এতো ভালো মানুষ। আপনারা আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন, একথা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম!"

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। স্থনয়িতে শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে

সবই যখন জেনে গেলাম এবং গ্রাম থেকে কেউই যখন পালিয়ে যেতে পারেনি তাহলে শত্রুসৈন্যের ছদ্মবেশ ধরে এই বন্দীদের ব্যবহার করে শত্রুসৈন্যদলকে প্রতারিত করে আমরা একটা সহজ-বিজয় অর্জন করে নিই না কেনো? রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলাম, তিনি তক্ষনি রাজী হয়ে গেলেন। তারপর দুজনে গেলাম চীফ-অফ-স্টাফ এর কাছে—এবং তাঁর সম্মতিও পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন: "এটা একটা চমৎকার বুদ্ধি। একথা বোঝাবার জন্যই আমি বলেছিলাম একটু মাথা খাটিয়ে কাজ করতে।" সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটু হুঁশিয়ারও করে দিলেন: "আমাদের নিজেদের ছদ্মবেশ একেবারে ঠিক ঠিক শত্রুসৈন্যের মতো করে নিতে হবে। যদি শত্রু কোনো মতে একটুও সন্দেহ করতে পারে তবে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

এই 'অভিনয়ে' প্রধান অভিনেতা নির্বাচিত হলেন প্রথম ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার কমরেড সেং পাও-তাং, তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা, আমাদের স্কাউটদের প্ল্যাটুন এবং আমাদের রেজিমেণ্টের জনত্রিশেক বিউগলবাদক! এরা সবাই নিখুঁতভাবে শত্রুসৈন্যের পোষাকে সেজে নিলেন। যে বন্দীদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা পদপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে যাবেন ঠিক হলো। আমাদের পুরো রেজিমেণ্ট পেছনে পেছনে যাবে যদি পরিকল্পনাটা ভেস্তে যায় তবে তারা খোলাখুলি পুরাদস্তুর আক্রমণ শুরু করবে।

রাত ন'টার সময় মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে রওয়ানা দিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, রাস্তা ঘাট অসম্ভব রকম পিছল, সারাটা পথ হোচট খেয়ে খেয়ে চলতে হলো, সারা গা কাদায় মাটিতে একাকার হয়ে গেলো, মানুষ বলেই মনে হচ্ছিলো না আমাদের, দেখাচ্ছিলো মাটির তৈরী মূর্তির মতো। আমাদের খড়ের জুতোগুলো মাটিতে এমনভাবে আটকে যাচ্ছিলো যে প্রিয় বস্তুর প্রতি মায়া বা অর্থক্ষতির কথা ভেবে সেগুলো বের করে আনা সম্ভব হচ্ছিলো না। জুতোগুলো ছেড়ে যেতে খুবই রাগ হচ্ছিলো কিন্তু যদি ঐগুলো বের করার দিকে নজর দিই তো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে—তাই জুতোগুলো ফেলে দিয়েই চলতে বাধ্য হলাম আমরা। খড়ের ঐ জুতোগুলো আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, কতো না পাহাড় আর নদনদী আমরা ঐগুলো পরে পেরিয়ে এসেছি! খালি পায়ে চলতে লাগলাম আমরা, কিন্তু

পাথরকুচি, বাঁশের টুকরো ও কাঠের টুকরোয় ভরা কাদামাটিতে একাকার পথ দিয়ে চলা ছেলেখেলা ছিলো না আমাদের পক্ষে।

প্রচণ্ড সেই বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টা দুই দ্রুত ছুটে চলার পর বৃষ্টি কমে এলো—মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে মাঝ আকাশে একটা আলো দেখতে পেলাম। আমাদের বন্দীরা কানে কানে ফিসফিস করে জানালো আমরা শহরের কাছে এসে পড়েছি আর ঐ যে আলোটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে শহরের সদর ফটকেরই একটা আলো। আমরা হঠাৎ ইচ্ছা করে একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু করে দিলাম এবং নগর প্রাকারের দিকে ছুটে চলতে লাগলাম যেন শত্রুদের প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি!

সদর ফটকের ওপর থেকে ক্রুদ্ধ গলায় কে একজন আমাদের লক্ষ্য করে, হুঁশিয়ারি জানালো: "কে যায়?" আর ঐ সঙ্গে রাইফেলে গুলিভরার শব্দও শুনতে পেলাম।

আমাদের বন্দীরা শান্তকণ্ঠে আঞ্চলিক ভাষায় জানালো: "আমরা বন্ধু; তোমাদেরই আপন লোক।"

"কোন্ ইউনিট?"

এবার বন্দী কোম্পানী কমাণ্ডার আমাদের আগে থেকে শেখানো কথা অনুযায়ী জবাব দিলেন, জোরে বললেন—"শহরের প্রান্তের ব্যাটালিয়নের লোক আমরা। কমিউনিস্ট দস্যুরা আজ আমাদের ঘিরে ফেলেছিলো। গ্রাম ওরা দখল করে নিয়েছে—ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মারা গেছেন। আমরা প্রথম কোম্পানীর লোক—আমিই কমাণ্ডার—যে কয়জন প্রাণে বেঁচেছি তাদের নিয়ে এসেছি। দস্যুরা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি গেট খুলে আমাদের ভেতরে যেতে দাও!"

"তোমাদের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের কী নাম?" —কে একজন জানতে চাইলো ভেতর থেকে।

কোম্পানী কমাণ্ডার বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নাম জানিয়ে দিলেন। মুহূর্ত খানেক সব চুপচাপ; স্পষ্টতঃ বোঝা গেলো সদর ফটকের শত্রুসৈন্যরা এতো-সরাসরি জবাব পেয়ে যাবে আশা করিনি। শুনলাম তারা নিজেরা কথা-বার্তা বলছে। তাদের সময় দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় কিন্তু আমাদের ছিলো

না, ওদের ভেবে দেখার সুযোগ দিতে আমরা চাই না—কাজেই আমরা একটা নকল 'আক্রমণ' সাজিয়ে নিলাম। আমরা চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করলাম—তারস্বরে একজোটে চেঁচাতে লাগলাম, "তাড়াতাড়ি করো—দরজা খুলো, জলদি করো, মেরে ফেললো! ডাকাতরা এসে পড়লো বলে!"

কে একজন ধমকে উঠলো: "বিস্তর চেঁচিয়ো না!" বোঝা গেলো, পদস্থ কোনো অফিসার বলছে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বেচারা বেজায় চটে আছে।

আমরাও অফিসার সাহেবের "আদেশ মান্য করে" চুপ করে গেলাম। হঠাৎ সদর ফটক থেকে আলো এসে পড়লো আমাদের ওপর—বুঝলাম তারা আমাদের আরেকবার পরখ করে নিচ্ছে। কিন্তু ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় আমরা যে ঠিক কারা তা' বোঝা সম্ভব ছিলো না, সদর ফটক থেকে শুধু বোঝা যাচ্ছিলো কুয়োমিনটাং টুপি ও উর্দিপরা আমরা "তাদেরই আপন লোক"। তারা বললো: "ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও। অনর্থক চেঁচামেচি করোনা, গেট খুলে দিচ্ছি।"

আমাদের তখন আনন্দে পেট ফেটে যাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আমরা সঙ্গীন লাগিয়ে রাইফেল বাগিয়ে নিলাম আর উদ্বেগে আকুল হয়ে গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই "আমাদের আপনজনদের" অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

প্রথমেই শহরের সদর ফটকের খিল খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর সেই উঁচু আর প্রচণ্ড পুরু ফটকটি ধীরে ধীরে খোলার কর্কশ আওয়াজ হলো। একজন শত্রুসৈন্য ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আমাদেরই একজন স্কাউটকে: "কমিউনিস্ট ডাকাতরা কি উকিযাং পার হয়ে চলে এসেছে? তারা খুবই তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, তাই না?"

আমাদের স্কাউট জবাব দিলেন: "ঠিকই ধরেছো বাছাধন! তারা এর মাঝে সুনয়িতেই এসে পড়েছে। চেয়ে দেখো বাছা, আমরাই হচ্ছি চীনের শ্রমিক কৃষকদের সেই লালফৌজের সৈন্যরা!"

তড়াক করে আমাদের সৈন্যরা ঐ দু'জন শত্রুসৈন্যের মাথা লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করলো। বেচারারা বিনাবাক্যে আত্মসমর্পণ করলো, করুণ একটা আর্তনাদ করে মাথা ঘুরিয়ে ধপাস করে তারা মাটিতে বসে পড়লো।

এভাবে একটা গুলিও খরচ না করে আমাদের লোকজনেরা বন্যার মতো ঐ "ফাঁক" দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঝটপট টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে সদর ফটকের সৈন্যদের সকল যোগাযোগ ছিন্ন করে দিলো। আমাদের সঙ্গে যে জনা ত্রিশেক বিউগলবাদক ছিলেন তারা আক্রমণ শুরু করার আহ্বান বাজাতে লাগলেন—আর বিদ্যুৎ-বেগে আমাদের সৈন্যরা তখন শহরে ঢুকছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো অঞ্চলটা যুদ্ধক্ষেত্রের আকার ধারণ করলো। বিউগল বাজছে, ইতস্তত: মেশিনগানের ও রাইফেলের গুলি ছুটছে। আমাদের সৈন্যরা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে,—সর্বত্র আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে আর প্রাণভয়ে শত্রুসৈন্যরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে, আর্তনাদ করছে। শত্রুসৈন্যদের অধিকাংশকেই আমরা গ্রেপ্তার করে ফেললাম—এদের অনেকেই ঘুম ভেঙে বিছানা থেকে উঠেছে মাত্র—কাপড-চোপডও পরতে পারেনি। কিছু সৈন্য অবশ্য উত্তরের গেট দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। এটা একটা দেখার মতো দৃশ্য, প্রাণ নিয়ে ওরা তখন পালাচ্ছে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে!

৫ই জানুয়ারী সকালে সুনয়ি কুয়োমিনটাং বাহিনীর কবলমুক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করে দেওয়া হলো। সারা শহরের লোক দলবেঁধে আমাদের অভিনন্দন জানাতে এলেন: সব রাস্তায় লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রঙীন পতাকা উড়িয়ে, বাজী পুড়িয়ে তারা আনন্দের সঙ্গে আমাদের সৈন্য বাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন, নূতন জীবন শুরু হয়েছে জেনে তারা আনন্দে ও উল্লাসে ফেটে পডেছেন।

আমাদের ষষ্ঠ রেজিমেণ্টের একটা অংশ উত্তরের গেট দিয়ে পালিয়ে-যাওয়া শত্রুসৈন্যদের অনুধাবন করতে এগিয়ে গেলো, আমরা বাকীরা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কাজকর্ম শুরু করে দিলাম। স্থানীয় অত্যাচারী লোকদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং সশস্ত্র সামন্ত প্রভু ও জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। পরদিন আমরা আদেশ পেলাম তাংজের দিকে উত্তরমুখী অভিযানে রওয়ানা হতে,—বিশেষ কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা তাংজে শহর দখল করে নিলাম।

তাংজেতে আমরা প্রায় দু'সপ্তাহ কাটালাম,—ঐ সময়টাকে আমরা বিশ্রাম নেওয়া এবং সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করার কাজে লাগালাম। পরে জানতে

পেরেছি, সুনয়িতে আমাদের পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর বর্ধিত একটা অধিবেশন ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ;—ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সেই সম্মেলনে কমরেড মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে একটি নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। যে সর্বনাশা "বামপন্থী" সামরিক নীতি চূড়ান্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। এভাবে পার্টি ও বিপ্লবের পথে যে গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিলো তার অবসান ঘটলো। তারপর এ:কর পর এক জয়ের পথ ধরেই আমরা চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।

সোনালি বালির নদী পার হয়ে এলাম

মেজর জেনারেল সিয়াও ইং-তাঙ

১৯৩৫ এর বসন্তকালে ফার্স্ট ফ্রন্ট আর্মি কোয়াংসি থেকে উত্তরমুখে কিউচাও-এ চলে এলো। এখানে সুনয়ি, তাংজে ও চিশুই এর আশে পাশে যে কুয়োমিনটাং বাহিনী আমাদের গতিরোধ করতে এসেছিল তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হলো—বেশ কয়েকটি মাস ধরে এই লড়াই চলেছিলো। ক্রমেই বেশী বেশী করে যে শত্রুসৈন্যরা আমাদের ঘেরাও করতে এগিয়ে আসছিলো তাদের অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্য আমরা ১৯৩৫-এর এপ্রিলের শেষের দিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ইউনান এর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

পশ্চিমদিকে আমাদের যে তিনটি বাহিনী এগিয়ে চলেছিলো আমাদের রেড ক্যাডার্স রেজিমেণ্ট ছিলো তার মধ্যবর্তী বাহিনী—তার উপর পড়েছিলো পার্টি ও সরকারের নেতাদের রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব।

ঐ ক্যাডার্স বাহিনীতে ছিলো দুটো পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন আর তদুপরি ছিলো অগ্রসর ক্যাডারদের একটি গ্রুপ। অগ্রসর ক্যাডারদের গ্রুপের লোকেরা ছাড়া গোটা রেজিমেণ্টের সদস্যরাই ছিলেন কোম্পানী ও প্লাটুন পর্যায়ের অফিসার—প্রাণবন্ত তরুণের দল, নানা যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সৈন্য তাঁরা। ১৯৩২ সাল থেকে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের পঞ্চম কোম্পানীর আমি কমাণ্ডার ছিলাম, লং মার্চ শেষ হওয়ার পর উত্তর শেনসিতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমি ঐ পদেই বহাল ছিলাম।

এপ্রিলে ইউনানে এমন গরম পড়ে যে গা চটচট করতে থাকে। একটা মাত্র সুতির জামা গায়ে থাকলেও সারা গা ঘেমে একাকার হয়ে যায়। ঐ সময়টাতে ভেজা মাঠে মাঠে নবীন ধানের মঞ্জরী বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে, মনে হচ্ছিলো যেন আমাদের তা স্বাগত জানাচ্ছে। দু পাশের পাহাড় গাছপালায় ভরা, ঘাসে ও ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত। মধুভরা ফুলে ফুলে মৌমাছিরা গুঞ্জরণ করছে—প্রজাপতিরা ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বসন্তের দৃশ্যটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর—কিন্তু এসবের দিকে তাকানোর অবকাশই ছিলো না আমাদের, দাঁড়ানোরই সময় ছিলো না ;—প্রায় এক লক্ষ কুয়োমিনটাং সৈন্য আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে।

একদিন রাত্রে একটা গ্রামে আমরা আস্তানা ঠিক করলাম। মাঝ রাতে সব দেখে আসতে বের হলাম। যেতে যেতে দেখি যে বাড়ীতে পার্টি ও সরকারের নেতারা রয়েছেন সেখানে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম এতো রাতে কোন্ নেতা জেগে রয়েছেন কে জানে? আমি প্রহরীর সঙ্গে কথা বলছিলাম—এমন সময় কে একজন বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কাছে এগিয়ে এলে চিনতে পারলাম—কমরেড চৌ এন-লাই ; আমি অন্ধকারেই সোজা হয়ে দাঁড়ালাম : "ভাইস চেয়ারম্যান, আপনি এখনো ঘুমোন নি?"

"না ; তুমি নাকি? সব দেখাশোনা হয়ে গেছে? আসো না, একটু কথাবার্তা বলা যাক।"

বাড়ীটা একজন প্রাক্তন জমিদারের ; বেশ ভালো বাড়ী। যে ঘরটিতে ভাইস-চেয়ারম্যান রয়েছেন সেখানে অদ্ভুতদর্শন কয়েকখানি চেয়ার দেখতে পেলাম আর সেই রকমেরই একটি টেবিল। টেবিলের উপরে একটা আলো জ্বলছে—আর কিছু কাগজ ও লেখার জিনিসপত্র ছড়ানো। কাগজের একটা মোড়ক রয়েছে টেবিলে। দেয়ালে ঝুলছে মস্তোবড়ো একটা বাতি। ভাইস-চেয়ারম্যান ফৌজের এগিয়ে চলার পথ নিয়ে ভাবছিলেন বোঝা গেলো। মৃদু আলোয় তাঁর মুখ হলদে আর শুকনো দেখাচ্ছিলো, তাঁর চোখগুলোও সব সময়ের মতো তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো না।

বসার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "পঞ্চম কোম্পানীতে তোমরা কতোজন রয়েছো?"

"সুনয়ি ও তুচেং-র লড়াইয়ে আমাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—আমরা এখন একশ' কুড়িজন রয়েছি।"

অভিযান চালিয়ে আসার পথে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলেন, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারপাতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন, সাধারণ সৈন্যদের মনোবল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁর সব কটি প্রশ্নেরই আমি যথাযথ জবাব দিলাম।

এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে উনি হেসে হেসে বললেন : "সুনয়ি ও তুচেংতে

তোমার কোম্পানী খুবই ভালো লড়াই করেছে। ভবিষ্যতেও কিন্তু এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখা চাই!"

এক প্যাকেট বিস্কুট খুলে টেবিলে রেখে আমাকে খেতে বললেন। ঐ ছিলো তাঁর সাহায্যকারীর তৈরী করা মাঝরাতের খাবার।

বললাম: "ভাইস চেয়ারম্যান, ওগুলো আপনিই খান। সন্ধ্যাবেলা প্রচুর খেয়েছি—এখনও পেটভরা।"

তিনি প্যাকেটটি আমার সামনে তুলে ধরলেন এবং তা থেকে খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন। আধখানা বিস্কুট নিয়ে চিবোতে চিবোতে তাঁর অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। শেষে বললেন: "ঠিক আছে; অনেক রাত হয়ে গেলো। এখন একটু বিশ্রাম করোগে যাও।"

ভাইস চেয়ারম্যানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছিলো। উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোম্পানীর ব্যাপারে সব খোঁজ নিলেন। এটা কি সাধারণ খোঁজ খবর নেওয়া, না আমাদের ওপর গুরুতর কোনো দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে? আমার বুকে তোলপাড় শুরু হলো। কেন যে সাহস করে জিজ্ঞেস করিনি তার জন্য আফশোস হলো।

পরদিন সৈন্যদল যাত্রা করল না। এই সুযোগে লোকজনেরা নিজেদের ঝাড়া-মোছা ধোওয়া-ধোওয়ির কাজ করে নিচ্ছিলো, বাড়তি কিছু খাবার জোগাড় করে নিচ্ছিলো। কেউ ধান ভানতে লাগলো, কাপড় সেলাই করছিলো কেউ কেউ, অন্যরা রাইফেল মোছামুছি করছিলো, কেউ কেউ বেয়নেটে ধার দিয়ে নিচ্ছিলো। আমরা কজন দাওয়ায় বসে খড়ের চটি বানাচ্ছিলাম আর লোকজনের কথাবার্তা শুনছিলাম।

"শত্রুরা ধেয়ে আসছে অথচ আমরা বেশ চুপটি করে বসে রয়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার!"

"এর মাঝে আবার অদ্ভুতের কী আছে? হয় আমরা শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করছি লড়বার জন্য, আর নয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের প্রস্তুতি হচ্ছে।"

"গুরুত্বপূর্ণ কী কাজ থাকতে পারে? আমরা কি কুনমিং-এর দিকে

যাবো, না, সোনালি বালির নদী পার হতে যাবো ?" —কে একজন জানতে চাইলো।

ঐ প্রশ্নের পর একটা নীরবতা নেমে এলো। সবাই আমার দিকে তাকালো।

"কী জানি! নেতৃস্থানীয় কমরেডরা কোনো নির্দেশ দেন নি এখনো।"

বিকালের মধ্যে আমাদের প্রস্তুতি সারা হযে গেলো। কাপড চোপড ধুযে গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, রেশনের ব্যাগ ভরে নেওয়া হযেছে, রাইফেল ও বেয়নেট সব ঝকঝক করছে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—আমরা রওনা হচ্ছি না কেনো ? আমিও ভাবছিলাম—এদের প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমারও কেমন যেন লাগছিলো। খবরের খোঁজে বেরিয়ে পডলাম।

বেশ বডো গ্রাম; প্রায় দু'শ পরিবারের বাস। চারিদিকে সব চুপচাপ, শান্ত, ঘরবাডী ও চালা ঘরগুলো সবুজ ধানের ক্ষেতের গা ঘেঁষে দাঁডিয়ে রয়েছে। লোকজনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলেই মনে হলো; অন্ততঃ কিউচাও-এর চেয়ে এখানের লোকেরা যে বেশ ভালো আছেন তা সহজেই বোঝা যায়। সাজ-পোষাক দেখে মনে হচ্ছিলো বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন বাস করেন এখানে—কিন্তু প্রতিটি পরিবারের জোযান মরদেরা সব পালিযে গেছে, শুধু বৃদ্ধ ও শিশুরা গ্রামে রযেছে। সন্দেহ নেই, কুয়োমিনটাংরা যতো সব আজেবাজে গুজব রটিযেছে আমাদের সম্পর্কে—যখনই মার খেযে পালাতে হয় তখন এটাই হয় এদের অন্যতম অপকর্ম।

একটা পরিত্যক্ত প্রাথমিক স্কুলের সামনে বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছেঁডা কাগজপত্রের মধ্যে ইয়ুনানের একটি ম্যাপ পেলাম। এযাবৎ নেতৃত্বের এবং পথপ্রদর্শকদের ওপর আমরা পথ চলার জন্য নিভর করে ছিলাম। এখন একটা ম্যাপ পেলাম, যতো সাধারণ ম্যাপই হোক না কেনো তাতে আমাদের প্রচুর সুবিধা হলো। ম্যাপ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো উত্তরে জাপানকে প্রতিরোধের জন্য যেতে হলে সোনালি বালির নদীটি আমাদের পার হতেই হবে। সোনালি বালির নদী শত্রুপক্ষ সতর্ক প্রহরাধীনে রেখেছে তাই এই নদী সসৈন্যে পার হতে গেলে প্রচণ্ড লডাই করতে হবে আমাদের।

ফিরে এসে পার্টি ও সরকারের নেতারা যে ঘরে আছেন সেখানে গেলাম। নানা লোক সেখানে ব্যস্ত সমস্ত হযে যাওযা আসা করছেন দেখতে পেলাম।

মনে হলো ভেতরে একটা সভা হচ্ছে। যদিও তাঁদের অনেককে আমি চিনতাম কিন্তু কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত মনে করলাম না। অন্যান্য কোম্পানীর কাছে গেলাম—দেখলাম সবাই আমার মতোই কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছেন। বোঝা যাচ্ছিলো কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।

তৃতীয় দিনের দুপুরের মধ্যেই খবর এলো শত্রুসৈন্যরা পেছন থেকে ধাওয়া করে আসছে এবং আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তখনও আমাদের দিক থেকে কোনো তৎপরতার লক্ষণই নেই। প্রত্যেকটি সৈন্যই কেমন যেনো অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দুপুরের দিকে রেজিমেণ্টের সংবাদ-বাহককে আমাদের কোম্পানীর দপ্তরের দিকে আসতে দেখলাম।

আমি তাড়াতাড়ি করে জিজ্ঞেস করলাম: "রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার কি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন ?

সংবাদবাহক বিস্মিত হয়ে বললেন: "আপনি জানলেন কী করে ?"

তাঁর প্রশ্ন শুনেই বুঝলাম আমার অনুমান সত্য। আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গেলাম রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরের দিকে, সঙ্গে নিয়ে গেলাম আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী কে।

গিয়ে দেখি ঘর-ভর্তি লোকজন। রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার চেন কেং আর পলিটিক্যাল কমিশার স্থং জেন-চিয়ুং ছাড়াও সেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব-শীল কমরেডরা রয়েছেন, তাঁদের ক'জনকে আমি চিনতেও পারলাম। কড়া তামাক পাতার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। বুঝলাম একটা সভা চলছে। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার বললেন: "কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের সৈন্যরা সোনালি বালির নদী পার হয়ে যাবে—ফেরীঘাটটি দখল করার ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের রেজিমেণ্টকে। আমাদের দিক থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন এগিয়ে যাবে এবং পঞ্চম কোম্পানী অগ্রসর-বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তোমাদের কাজ হলো: যে কোনো প্রকারে এবং যত দ্রুত সম্ভব ফেরীঘাটটি দখল করা—আর আমাদের সৈন্যবাহিনীর নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা করা। প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়ো।" কালো পোষাকপরা একজন কমরেডকে দেখিয়ে বললেন: "ইনি হচ্ছেন কমরেড লী; তোমাদের এই কাজে সাহায্য

করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে দল পাঠিয়েছেন ইনি তাঁদের ভারপ্রাপ্ত। সাধারণভাবে অভিযানের দায়িত্ব তাঁর ওপরই থাকবে।"

কমরেড লীর সঙ্গে করমর্দন করে নিলাম এবং কখন রওয়ানা দেবো সে ব্যাপারে দু' একটি কথা বলে নিলাম। তারপরই আমাদের কোম্পানীর সদর দপ্তরে ফিরে এলাম।

সৈন্যদের জড়ো করা হলো, খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে হালকা অস্ত্রপাতি নিয়ে একটা ফাঁড়ি পথ ধরে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। আমি আর ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হুয়ো হাই-ইউয়ান অগ্রগামী প্ল্যাটুনটির পেছনে পেছনে চললাম। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আর আসল আক্রমণকারী বাহিনীটি আরেকটু পেছনে আসতে লাগলেন। ক্যাডার বাহিনী স্নুনয়ি ও তুচেঙ-এ পরপর দু'টো চমৎকার বিজয় অর্জনের পর খুবই খোশ মেজাজে ছিলো। দু'দিনের বিশ্রামের পর তারা আরো সতেজ বোধ করছিলো। অগ্রসর বাহিনীর পুরোগামী দলটি খুবই আনন্দে দ্রুত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলো। পথটা ছিলো আগাছায় ভরা এবং পথের চিহ্নই ভালো দেখা যাচ্ছিলো না এই দিনের বেলাতেও, রোদে তখন সবাই ঘামছে দরদর করে —তবু প্রায় চার মাইল একটানা হেঁটে চললো। কেউ কোনো নালিশ করছে না বা একজনও একটু দমে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে না। এভাবে একটানা সারা রাত আমরা হেঁটে চললাম। ভোরের দিকে মিনিট দশেক জিরিয়ে নিয়ে, সঙ্গে আনা ঠাণ্ডা ভাত ক'টি গিলে, ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার সবাই রওয়ানা হলাম। এভাবে বাইশ মাইলের মতো হেঁটে গেলাম আমরা।

একটা পাহাড় পার হয়ে সোনালি বালির নদী থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এসে আমাদের সেনাদলটি খানিক জিরিয়ে নিলো। এই বিশ্রামের সময় আমি আর কমরেড লী একত্র বসে কী করে ফেরীটি দখল করা যায় তা' নিয়ে ভেবে নিলাম। ঠিক করলাম এ পারের যে প্রহরীরা রয়েছে প্রথমে তাদের শেষ করে ফেলবো, তারপর নৌকাগুলো দখল করে নিয়ে ওপারে গিয়ে উঠবো আর ওপারের শত্রুসৈন্যদের জব্দ করে ফেলবো। এভাবে ফেরীঘাটটি নিরাপদ করে রেখে, আমাদের পুরো সৈন্য বাহিনীটির নদী পার হওয়াকে সুনিশ্চিত করবো।

নদীর পারে যখন পৌঁছেছি তখন সূর্য ডুবে গেছে। আমাদের সামনে

উঁচু ঘন কালো এক জঙ্গল ; পাহাড়ের নীচ থেকে গাছপালাগুলো ভালো দেখা যাচ্ছে না। এই পাহাড়ী জঙ্গলের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে সোনালি বালির নদী ধুসর ক্ষুরধার জলরাশি নিয়ে। দু'পারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে এখানে ওখানে কয়েকটা আলো জ্বলছে—যেন শত্রুরা উঁকি দিয়ে আমাদের দেখছে! কে জানে, শত্রুরা হয়তো আমাদের দেখতেও পেয়েছে! হতে পারে তারা হয়তো আমাদের জন্য তৈরী হয়েই আছে। কিন্তু যাই হোক দায়িত্ব পালন আমাদের করতেই হবে। একেবারে নদীর পারে এসে পড়েছি, আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম: "নদীতে এসে গেছি ; সবাই তৈরী হয়ে নাও!"

অন্ধকারে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথম প্ল্যাটুনের দলপতি খবর নিয়ে এলেন: "শত্রুরা জেনেছে যে আমরা ইয়ুনানে প্রবেশ করছি। আমরা সোনালি বালির নদী পার হতে পারি একথা ভেবে তারা গত ক'দিনে ওপর পারের প্রায় একশ লী জুড়ে সৈন্য মোতায়েন করেছে, সমস্ত ফেরী বন্ধ করে দিয়েছে, যতো নৌকা ছিলো সব আটক করে ওপর পারে নিয়ে গেছে, সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। নদীর এপারে সাদা পোষাকে লোক পাঠাচ্ছে আমাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে, আজ ঐ লোকেরা তাদের ক'খানি নৌকা এপারে রেখে আশে পাশের গ্রামের লোকজনদের ভয় দেখাতে গেছে। আমাদের লোকেরা যখন নৌকার কাছে গিয়েছিলো—একজন মাঝি নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে তাদের লোক মনে করে জানতে চাইলো: "তোমরা ফিরে এসেছো?" আমরা "হ্যাঁ, এই এলাম!" বলেই ঝপাঝপ নৌকায় উঠে লোকগুলোকে কাবু করে নিয়েছি। এখন এই নৌকা ক'খানা আমাদেরই সম্পত্তি!"

প্ল্যাটুন লীডারের কথা বলা শেষ হতেই তাকে নিয়ে বন্দী মাঝিদের কাছে গেলাম। লোকগুলো ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে,—তাদের অভয় দিয়ে ওদের কাছ থেকে ওপর পারের শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে যথাসম্ভব খোঁজ খবর জেনে নিতে চেষ্টা করলাম। থেমে থেমে ওরা একে অন্যে মিলিয়ে যা বললো তা হচ্ছে: ওপর পারে একটা ছোটো শহর রয়েছে—একজন তহশীলদার আছেন আর তার সঙ্গে আছে জনা ত্রিশেক পুলিশ। ঐ দিন সকালে এক কোম্পানী নিয়মিত শত্রুসৈন্য এসেছে—তারা শহরের খানিকটা দক্ষিণে

আস্তানা গেড়েছে। শহরের মাঝখানে নদীর পারে একটা পাথর-বাঁধানো জেটি রয়েছে—ওখানে একজন পুলিশ প্রহরায় থাকে; এখন অবস্থা একটু অন্যরকম তাই আরেকজন পুলিশকেও ওখানে থাকতে দিয়েছে প্রহরার জন্য। লালফৌজ নদী পার হতে পারে এই ভয় তাদের আছে—কিন্তু এটা প্রধান ফেরী নয়, তাছাড়া এতো তাড়াতাড়ি যে লালফৌজ এসে পড়বে তা ওরা ভাবতেই পারেনি তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখনও তেমন শক্ত নয়।

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে অবিলম্বে নদী পার হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বন্দী মাঝিদের প্রশ্ন করতে লাগলেন,—তাদের পুরস্কার দেওয়ার কথা দিলেন। বেচারা মাঝিরা শত্রুদের হাতে নানা জ্বালাতন সয়েছে। এখন যখন দেখলো যে দু'টি পয়সা তারা পেতে পারে—তারা আগ্রহ ভরে বললো: "আপনারা যা বলবেন তাই করবো আমরা।"

আমি প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটুনকে আমার সঙ্গে নদী পার হতে বললাম। পেছনে রয়ে গেলেন ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং আমাদের মূল বাহিনীটি। তৃতীয় প্ল্যাটুনকে ভার দেওয়া হলো নদীতীর পাহারা দেওয়ার জন্য এবং নদী পেরোবার সময় আমাদের কোনো কিছু ঘটলে আমাদের সাহায্যে গুলিগোলা বর্ষণ করার জন্য।

তৃতীয় প্ল্যাটুন নদীর পারে ছড়িয়ে পড়লো—আর শহরের আলোর দিকে তাদের বন্দুকগুলো তাক করে রাখলো। ওপর পারে গেলে আমরা কী করবো তাদের বলে দিয়ে যদি কোনো অঘটন ঘটে তবে তাদের কী করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটুনকে নিয়ে আমি ধীরে, নিঃশব্দে দুটো নৌকায় চড়ে বসলাম। নৌকা ছেড়ে দিলো।

হাওয়া বইছিলো। একশ গজের বেশী চওড়া নদীতে নৌকা গুলো তীব্র স্রোতে দোল খাচ্ছিলো। আমাদের কজন লোক মাঝিদের সাহায্য করতে লাগলো। অন্যরা রাইফেলগুলো নিয়ে গাদাগাদি করে বসলো জলের ঝাপটায় যাতে ভিজে না যায় তার জন্য।

ধীরে ধীরে নদীর পারে পৌছার আগেই আমার পাশের দুজনকে লাফিয়ে গিয়ে পাশের সিঁড়িতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়াতে বললাম।

"হেই, তোমরা এতো দেরী করলে কেনো?"—ইয়ুনানী ভাষায় ভাঙ্গা গলায় কে একজন জানতে চাইলো।

আমাদের সৈন্য দু'জন তখনই কোনো জবাব দিলো না। তারপর শুনলাম একজন আস্তে আস্তে বলছে : "নড়াচড়া করো না!"

একথা শুনেই আমি অন্যদের নিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়িতে ঝাপিয়ে পড়লাম—আর অন্য কিছু টের পাওয়ার আগেই শত্রুদের প্রহরী দুজন আমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লো।

ঐ বন্দী দু'জন দেখতে অনেকটা আমাদের বন্দী মাঝিদের মতোই। আমি প্রথম প্লাটুনকে রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে কুয়োমিনটাং-এর নিয়মিত সৈন্যদলটিকে আক্রমণ করতে পাঠালাম আর দ্বিতীয় প্ল্যাটুনকে পুলিশদের ক্যাম্পটি আক্রমণের জন্য আদেশ দিলাম। আমি জেটিতে দাঁড়িয়ে রইলাম ওদের খবরের অপেক্ষায়।

নৌকাগুলোকে ওপারে পাঠালাম আমাদের অন্যলোকজন দের নিয়ে আসার জন্য।

আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের বার্তাবাহককে বললাম কিছু লতাপাতা ও গাছপালা জড়ো করে একটা আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য—তাহলে আমাদের কোম্পানী জানতে পারবে যে আমরা নদী পার হয়ে গেছি।

তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো—নদীর জলে তার ছায়া পড়লো। সিগন্যাল দেওয়া হলো, এখন সব নির্ভর করছে আমাদের প্ল্যাটুন দু'টির নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করার ওপর। এসব কথা ভাবছি—এমন সময় কটা গুলির আওয়াজ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এর অর্থ কী? অস্বস্তি লাগছিলো—এমন সময় বার্তাবাহকরা ছুটে এসে খবর জানালো।

ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা হলো : প্রথম প্ল্যাটুন যখন শত্রুর কোম্পানীর সদর দপ্তরে পৌছলো পাহারাদার জিজ্ঞেস করলো : "কে যায়?" আমাদের বন্দীরা আমাদের শেখানো কথা মতো বলে উঠলো : "তোমাদেরই লোক আমরা, পুলিশ!" পাহারাদার অন্য কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমাদের সৈন্যরা ছুটে গিয়ে তাকে কবজা করে ফেললো। ওকে ক'টি কথা জিজ্ঞেস

করে আমাদের সৈন্যরা আলাদা আলাদা ঘরের সামনে গিযে দাঁডালো ! লাথি মেরে দরজা ভেঙে তারা চীৎকার করে বললো : "অস্ত্র সমর্পণ করো, প্রাণে বেঁচে যাবে !"

শত্রুসৈন্যরা ভ্যাবাচেকা খেযে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে হাত তুলে বললো : "আমরা আজই এসেছি। হতে পারে কোনো ভুল বোঝা-বুঝি হযেছে।"

আমাদের সৈন্যরা বললো : "কোনো ভুল বোঝাবুঝি হযনি বাছারা ! আমরা লাল ফৌজের লোক, আমরা তোমাদের জন্যই এসেছি !"

শত্রুসৈন্যরা একে অন্যের দিকে চাওযা-চাওযি করতে লাগলো। আমাদের সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচিযে তাদের একত্র জডো করলো। কোম্পানী কমাণ্ডার ও ক'জন অফিসার অন্য একটি ঘরে ছিলো—তারা ক'টিগুলি ছুডে অন্ধকারে পালিযেছে। রাস্তাঘাট চেনা নেই বলে আমাদের সৈন্যরা আর ওদের ধাওযা করে নি।

দ্বিতীয প্ল্যাটুনেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতাই হযেছে। তারা খাজানা প্রদান-কারী সেজে তহশীলদারের অফিসে ঢুকেছে। পুলশেরা জালে আটকে পডা মাছের মতো ধরা পডেছে—তাদের ক্যাপটেনও পালাতে পারেনি।

সব কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। উত্তেজনা দমন করে রাইফেল দাঁড করিযে রেখে, দ্বিতীযবার আগুন জ্বালিযে সিগন্যাল জানাবার জন্য নির্দেশ দিলাম।

জেটি দখল হযে যাওযার পর ধীরে সুস্থে শহরের দিকে চললাম। শহরে পা দিযে অন্ধকারে ঘরবাডী দেখে হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো—খেযে দেযে ঘুম দেওযার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো। রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে কথাটা বলতে যাবো এমন সময ডেপুটি ব্যাটালিযন কমাণ্ডার এসে বললেন :

"ফেরীটার প্রতিরক্ষা সংহত করার জন্য এবং আমাদের নিযন্ত্রণ বিস্তৃত করার জন্য রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার নির্দেশ পাঠিযেছেন আপনার লোকজনকে নিযে আরো পঞ্চাশ লী এগিয়ে যেতে—পাহাডী পথ ধরে হুইলি পর্য্যন্ত পৌছে ওখানে প্রহরার ব্যবস্থা করতে।"

সৈন্যরা আদেশ শুনেই ঝটপট রাস্তায জডো হযে গেলো। প্রত্যেকেই

বললো তারা রওয়ানা দিতে প্রস্তুত। আমি জানতাম—ওরা সবাই ভীষণ ক্ষুধার্ত, তাদের এক রতি শক্তিও নেই। আর তা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। চু'শ লী (প্রায় ৬৬ মাইল) ওরা পাড়ি দিয়ে এসেছে—বিশ্রাম বলতে কিছুই হয়নি—মাঝখানে ক'মুঠো ঠাণ্ডা ভাত চিবিয়েছে। রান্না করারও সময় নেই —আশেপাশে কোনো খাবারের দোকানও নেই। তবু আমরা রওয়ানা দিলাম। পথের পাশে একটা সাইনবোর্ড দেখে তার কাছে গিয়ে তাকিয়ে বুঝলাম—একটা প্যাষ্ট্রির দোকান। ভাবলাম, "তাই ভালো; একদম কিছু না খাওয়ার চেয়ে প্যাষ্ট্রিই খাওয়া যাক!"

ঠেলে দরজা খুললাম। ভেতরে ঢুকে দেখি—সব অন্ধকার; কেউ কোথাও নেই। বেচারা দোকানী গুলির শব্দ শুনেই চম্পট দিয়েছে। আলো জ্বালানো হলো। দেখলাম একটা থাকে অনেক প্যাষ্ট্রি তৈরী রয়েছে। আমাদের লোকেরা তা শুঁকে দেখলো।

ভাবলাম: "উপায় নেই; কেনাবেচা আমাদেরকেই করতে হবে।" আমাদের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো—গড়ে প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম করে পড়লো জনপ্রতি। ক'জন তা মুখে পুরে এক লহমায় গিলে ফেললো।

„যা বাবা! কী খেলাম টেরই পেলাম না!" ক'জন তো মুখ মুছতে মুছতে বলেই ফেললো।

"গোল করো না মিছেমিছি! আমরা অগ্রসর বাহিনী; না হলে কি এইটুকুও কপালে জুটতো?" —কে একজন একটু রসিয়ে বললো কথাটা।

যাই হোক "ভোজন" পর্বের পর আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার বারোটা রূপোর ডলার রেখে দিলেন কাউন্টারে। তারপর আলো নিবিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম।

শহর থেকে বেরিয়ে আমরা প্রায় সতেরো লী হেটে গেলাম, একটি পাথুরে পথ ধরে পৌছলাম এসে বাঁ দিকে একটা মরা নদীর তীরে। এখানে মোটামুটি সমতল একটা জায়গা পাওয়া গেলো—আমরা ওখানেই আমাদের রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। লোকজনেরা কিছু কাঠ জোগাড় করে এনে আগুন জ্বালালেন, জল এনে রান্নাবান্না শুরু করলেন। চাল সেদ্ধ করে, জল ফুটিয়ে যা হোক করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই রাইফেলগুলোকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম। চোখ খুলে দেখি ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

"কোম্পানী কমাণ্ডার সিয়াও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন! যাত্রা শুরু করুন!" তাঁর কণ্ঠে ব্যগ্রতার স্বর।

আমি চমকে উঠে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম,—"কিছু ঘটেছে না কি?"

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার দূরের একটি উঁচু পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এই রাস্তা ধরে চল্লিশ মাইল চলে গেলে আপনারা পাহাড়টির চূড়ায় পৌঁছে যাবেন। শত্রুরা যদি আগে এটা দখল করে নিতে পারে—তাহলে এরকম একটা সুবিধাজনক জায়গা থেকে তারা আমাদের প্রচণ্ড বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারবে। রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের নির্দেশ হলো রাত শেষ হবার আগেই ঐটি আমাদের দখল করে নিতে হবে যাতে আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফেরীর রক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরো জোরদার করে তুলতে পারি।"

"আমাদের রেজিমেণ্ট, পার্টি ও সরকারের নেতারা তো একদিনের মধ্যেই পেরিয়ে যেতে পারবেন। তা হলে ফেরীর প্রতিরক্ষাকে এতো দীর্ঘস্থায়ী করে কী লাভ?" —আমি একটু সংশয়ের সুরেই জিজ্ঞেস করলাম।

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার একটু হাসলেন। বললেন, "কথাটা খুব ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমাদের পুরো বাহিনীটাই যে ঐ পথ ধরে আসছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম: "কী বললেন? প্রথম ও তৃতীয় বাহিনী কি এই পথ ধরেই আসছে?"

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মাথা নেড়ে বললেন: "ঠিকই ধরেছেন!"

আমার কাছে সবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অভিযান শুরুর আগে নেতাদের জরুরী মিটিং-এর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ এন-লাই এর উদ্বেগ ও আমাদের কোম্পানী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার তাৎপর্য সবই এখন বুঝতে পারলাম—শুধু আমাদের বাহিনীটিই নয় গোটা সৈন্যবাহিনীই যে এই পথ ধরে যাবে তার জন্যই এতো সব প্রস্তুতি তা বুঝতে পারলাম। সৌভাগ্যবশতঃ ফেরীটা আমাদের হাতেই রয়েছে। আমি যেন দেখতে পারছিলাম আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা অবিরাম স্রোতে দলে দলে নদী পার হয়ে আসছেন! তারা নিশ্চয়ই এখন বলাবলি করছেন:

"আমাদের ক্যাডার রেজিমেন্টই রাস্তাটি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছে।" এসব কথা ভেবে খুবই উৎসাহিত বোধ করছিলাম—বুঝতে পারছিলাম আমাদের এই অগ্রসর বাহিনীর ওপর কী গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। প্ল্যাটুন লীডারদের চটপট একত্র জড়ো করলাম—তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে রওয়ানা দিতে বললাম।

ঘুম থেকে উঠে আর এখনই রওয়ানা হতে হবে শুনে সৈন্যদের বিরক্তি দেখা দিলো: "ফেরী দখল করেছি, নদী পেরিয়ে এসেছি—এখন এতো তাড়া কেনো রে বাবা!" —"এখনও অন্ধকার রয়েছে! রাস্তাঘাট কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভোরের দিকে রওয়ানা দিলেই ভালো হতো!" —"এতো তাড়া কিসের বলো তো! এখানে কোনো শত্রুসৈন্য নেই, কোনো যুদ্ধও হচ্ছে না—তবু এতো হুটোপুটি কেনো!" সবাই এসব কথা বলাবলি করছিলো।

কিন্তু রাজনৈতিক উপদেষ্টা যখন সব বুঝিয়ে বললেন তখন তারা ঐ পাহাড়ের চূড়াটি দখলের গুরুত্ব ভালো করেই বুঝতে পারলেন। ফেরীর রক্ষা-ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এটা যে দরকার তা তারা বুঝলেন। সৈন্যদের যখন বলা হলো যে তারা আমাদের গোটা সেনাদলের অগ্রসর বাহিনী হিসাবে কাজ করছেন—তখন এক মুহূর্তে তাদের মনোভাব পুরোপুরি বদল হয়ে গেলো।

"চলুন—এই চল্লিশ লী এগিয়ে গিয়ে পাহাড়টি আমরা দখল করে ফেলি।" কে একজন মোটা গলায় চীৎকার করে বলে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই মনে মনে তৈরী হয়ে নিলেন।

"পাহাড়ের চূড়াটা দখল করে নিতেই হবে। সেনাবাহিনীর নদী পার হওয়াকে নিরাপদ করে রাখতেই হবে!"

"পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই হবে—আমাদের বাহিনীকে স্বাগত জানাতে হবে ওখান থেকেই!"

রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেওয়া হলো। সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য সবাই তখন ব্যগ্র।

রাত শেষ হয়ে আসছে। তার আগেই কোম্পানী পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলো। সবাই কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন। পাহাড়ের

ওপরটা মোটামুটি সমতল। দূরে ছোটো ছোটো পাহাড়ের অন্তহীন একটা সারি দেখা যাচ্ছিলো একটা ছোটো আকাবাঁকা পথ চলে গেছে ঐ পাহাড়ের থেকে হুইলির দিকে। পথটির দু' পাশের কিছু দূরের দু'টি পাহাড় দখল করে আমাদের সৈন্য মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে নিলাম। এই দু'টি পাহাড়ের মাঝদিয়েই হুইলি থেকে ফেরির দিকে পথটি চলে গেছে।

আমরা যখন ঐ পাহাড় দু'টির দিকে ছুটে চলেছি—আমাদের অগ্রবাহিনী বিপদ সংকেত জানালো। কুড়ি মিনিট পরে এক খণ্ড-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো—শত্রুরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে তখন।

আমরা ঠিক সময়েই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলাম। গতরাতে যদি মরা নদীটির পারেই আমরা থেকে যেতাম তবে আজ শত্রুর আক্রমণের মুখে পাহাড় বেয়ে উঠতে আমাদের বিরাট মূল্য দিতে হতো।

শত্রুরা অবস্থা আন্দাজ করতে না পেরে আক্রমণ করতে ভরসা পেলো না। আমরাও চুপ করে থাকলাম। দু' পক্ষ মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিকাল চারটা নাগাদ আমাদের বিশেষ ব্যাটালিয়নের ভারী মেশিনগান কোম্পানী এবং চতুর্থ কোম্পানী এসে পড়লো। তাদের সামনে হেঁটে আসছিলেন রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার চেন এবং পলিটিক্যাল কমিশার সুং। তাঁদের খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো। আমাদের লক্ষ্য করে প্রথমেই বলে উঠলেন: "তোমরা খুবই সুদক্ষ একটি বাহিনী।" আমি আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে বলতে কমাণ্ডারদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শত্রুদের অবস্থান লক্ষ্য করছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আমাদের কোম্পানী, চতুর্থ কোম্পানী এবং ভারী মেশিনগান কোম্পানীর অফিসারদের একটি সভা ডাকলেন আমাদের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। আমাদের কোম্পানী ডান দিক বেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে যাওয়া পথটি ধরে শত্রুদের আক্রমণ করবে; চতুর্থ কোম্পানী বা-দিক থেকে নেমে যাওয়া পথটি ধরে আক্রমণ চালাবে এবং ভারী-মেশিনগান-কোম্পানী দুটো পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের সৈন্যদের যাত্রাপথকে আড়াল করে রাখবে। শত্রুরা পরাজিত হওয়ার পর তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যেতে হবে—নূতন কোনো আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত।

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের যুক্ত নেতৃত্বাধীনে ভারী মেশিনগান থেকে গোলা বর্ষণ শুরু হলো, বিউগলগুলো বেজে উঠলো। আমি আক্রমণ শুরু করলাম। শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিলো। ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ও মাঠের মধ্য দিয়ে তারা পালাতে লাগলো। আমরা প্রায় বিশ লী তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেকে মারা গেলো, ক'জন মরার ভাণ করে মাটিতে পড়ে রইলো, অনেকে পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ে ইহলীলা সংবরণ করলো। শত্রুকে আমরা তাড়া করে নিয়ে চলেছি এমন সময় ঘোড়ায় করে একজন বার্তাবাহক খবর নিয়ে এলেন রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের কাছ থেকে: "শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করা বন্ধ করে দাও। কাছাকাছি একটা শিবির স্থাপন করে নজর রাখো।"

আমি সৈন্যদের পাহাড়ের গায়ের একটি গ্রামে সমবেত করলাম—শিবির স্থাপনের জন্য। আমরা তখন ভীষণ ক্লান্ত। অনেকে একেবারে ধপ করে মাটিতে শুয়ে পড়লো, নড়াচড়াই করতে পারছিলো না, এমন কি জল বা খাবারও চাইতে পারছিলো না। অন্যান্য লোকেরা বসে পড়ে আর উঠতেই শক্তি পাচ্ছিলো না।

সন্ধ্যার আগে আমাদের লোকেরা হঠাৎ চীৎকার করতে শুরু করলো আর পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটতে লাগলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম আমাদের বিরাট সংখ্যক সৈন্য পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের সম্মুখ বাহিনীটি গ্রামের কাছেই এসে পড়েছে—অথচ পেছনের দলটিকে তখনও দেখাই যাচ্ছিলো না। আমাদের লোকেরা বার্তাবাহকের কাছ থেকে শুনেছে যে এরা হচ্ছে তৃতীয় বাহিনীর সৈন্যদল, একথা শুনে সকল ক্লান্তি ও অনিদ্রার কথা ভুলে তারা ছুটে গেলো ওদের অভিনন্দন জানাবার জন্য—তা এতো দূর থেকে ওরা তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখার কোনো হুঁশই তখন ছিলো না তাদের!

তাতু নদী-জয়ী বীরেরা

জেনারেল ইয়াং তে-চি

১৯৩৫ সালে লালফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের প্রথম রেজিমেন্টের পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো আমার ওপর। ঐ বছরের যে মাসে আমরা সসৈন্যে সোনালি বালির নদী পার হয়ে সেচুয়ান ইয়ুনানের সীমান্ত ধরে কয়েকশ লী অতিক্রম করে পৌছলাম এসে দক্ষিণ সেচুয়ানের তাতু নদীর তীরে।

ইয়াংসি নদীর অন্যতম উপনদী তাতু প্রায় তিনশ গজ প্রশস্ত আর মাঝে মাঝে তার গভীরতা প্রায় বারো গজের মতো। উভয় তীর জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতমালার নিরবচ্ছিন্ন সারি। আমরা যখন নদী তীরে এসে পৌছলাম নদী তখন কানায় কানায় ভরা। প্রমত্ত ফেনিল জলরাশির উচ্ছ্বসিত গর্জন আর সবুজ আলোর একটি রেখা সৃষ্টি করে চারদিক কাঁপিয়ে তার ছুটে চলার শব্দ অনেক দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিলো। সামরিক দিক থেকে স্থানটির গুরুত্ব বহুকাল ধরেই সুপরিচিত। লালফৌজকে এখানে ধ্বংস করে ফেলার মিথ্যা স্বপ্নে মশগুল হয়ে চিয়াং কাইশেক আমাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেছেন। সেচুয়ানের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের চিয়াং নির্দেশ পাঠিয়েছেন—তাদের অঙ্গী বাহিনী পাঠিয়ে তাতু নদী ও লুটিং সেতুটির কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করতে।

শত্রুর এই চক্রান্তকে চুরমার করে দিয়ে উত্তরে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে যেতে হলে লালফৌজকে তাতু নদী পার হতেই হবে। এই গৌরবময় কর্তব্য সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়েছে প্রথম লাল রেজিমেন্টের ওপর—অগ্রসর-বাহিনী হিসাবে মিয়েনিং থেকে আমরা তাই রওয়ানা দিয়েছি।

নদী পার হওয়ার আগে আমরা নিখুঁতভাবে সব প্রস্তুতি করে নিলাম। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি শত্রুরা লুটিং সেতুর কাছে তিনটি "জবরদস্ত

বাহিনী" মোতায়েন করেছে;—আনশুনচাং-এর উল্টোদিকে ফেরী পাহারার জন্য নিয়োজিত করেছে পুরো একটা রেজিমেন্টকে এবং তার প্রায় দশ মাইল দূরে ভাটির দিকে রয়েছে তাদের আরো দু'টি রেজিমেন্ট।

অবস্থা বিশ্লেষণ করে আমরা আন্‌শুনচাং-এর ফেরী দিয়ে পার হওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম।

আনশুনচাং হচ্ছে তাতু নদীর দক্ষিণ পারে খানিকটা পশ্চিমদিকে প্রায় শ'খানেক পরিবার অধ্যুষিত একটা ছোট্ট শহর। শত্রুবাহিনীর দুটো কোম্পানী রয়েছে সেখানে। সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো, তল্লাটে একখানি মাত্র নৌকো রয়েছে। নদী পার হওয়ার জন্য লালফৌজের প্রথমেই দরকার হলো দক্ষিণ পারের শত্রু-বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ঐ নৌকোখানি দখল করে নেওয়া।

আনশুনচাং থেকে প্রায় চার মাইল দূরের একটা ঢালু জায়গায় আমরা যখন চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসে পৌঁছেছি রাত তখন দশটার বেশি। আশে পাশে দু' একখানি ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছিলো। তাতু নদীর জলরাশির গর্জন এখান থেকেই শোনা যাচ্ছিলো। আনশুনচাং-এর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিকের পাহাড়ে শীতের রাতের ঘন অন্ধকার আকাশে তারার মতো ক'টি আলো মিটমিট করছে দেখতে পেলাম।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় সাত-চল্লিশ মাইল অতিক্রম করে এসে সৈন্যরা তখন একান্ত ক্লান্ত। ওখানে থেমেই ধপ ধপ করে তাঁরা মাটিতে বসে পড়লো এবং অনেকে ঘুমিয়েও পড়লো। সৈন্যরা যখন জিরোচ্ছে আমি স্থানীয় লোকজনদের খুঁজে বের করে খবরাখবর জানার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ এলো : "আজ রাতেই আনশুনচাং-এর শত্রুবাহিনীকে আচমকা আক্রমণ করো এবং সসৈন্যে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকোখানি দখল করে নাও!"

অবস্থা পর্যালোচনা করে আমি এবং রেজিমেন্টের পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড লী লিন সিদ্ধান্ত নিলাম : প্রথম ব্যাটালিয়ন আমার সঙ্গে আনশুনচাং-এ যাবে। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন কমিশার লীর পরিচালনাধীনে প্রায় পাঁচ মাইল ভাটির দিকে গিয়ে শত্রুর উপর একটা নকল আক্রমণের ব্যবস্থা করে শত্রুদের মূল

বাহিনীকে ওখানে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তৃতীয় ব্যাটালিয়ন মূল জায়গাতে থেকে বাহিনীর সদর-দপ্তর আগলাবে।

সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা হলো। ক্লান্ত সৈন্যরা কাদামাখা দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং আনগুনচাং-এর দিকে রওয়ানা দিলো।

চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলতে লাগলাম। প্রায় চার মাইল পথ চলে আনগুনচাং-এর কাছাকাছি এসে পড়লাম। প্রথম ব্যাটালিয়নকে তিনটি কোম্পানীতে ভাগ করে তিনটি পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম—শত্রুর বিরুদ্ধে তিনখানি উদ্যত শাণিত হাতিয়ারের মতো।

আনগুনচাং-এর শত্রুবাহিনী ভাবতেই পারেনি যে লালফৌজ এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়বে। ক'জন অফিসার তো তাদের কোয়ার্টারে বসে জুয়াই খেলছিলো!

শত্রুপক্ষের প্রহরীরা আমাদের অগ্রসর বাহিনীকে দেখতে পেলো। তারা ভাবলো আমরা বুঝি ওদেরই লোক—জিজ্ঞেস করলো: "তোমরা কোন ইউনিটের লোক?"

লালফৌজের সৈন্যদের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো: "আমরা লালফৌজের লোক! যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো অস্ত্র সমর্পণ করো!"

ফট ফট করে কটা গুলি করলো শত্রুরা—কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। চারদিক থেকে আমাদের রাইফেলগুলো গর্জে উঠলো। যারা প্রতিরোধ করলো তাদের দফা তখনই রফা হয়ে গেলো—অন্যরা বন্দী হলো, কিছু কিছু পালিয়েও গেলো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুদের দুটো কোম্পানী শেষ হয়ে গেলো। আমাদের শক্তি পরীক্ষার কোনো দরকারই হলো না।

আনগুনচাং দখল করে নেওয়া হলো। একটা ছোটো ঘরে বসে নৌকোখানির কথা ভাবছি। এ সময় শুনলাম—কে চীৎকার করে বলছে: "কে যায়?" তারপর শুনলাম: "স্থির হয়ে দাঁড়াও! অস্ত্রপাতি সমর্পণ করো!"

এই বন্দী সৈন্যরাই ছিলো শত্রুর নৌকোখানির ভারপ্রাপ্ত। তারা এইমাত্র নদী থেকে আসছে। কী যে ঘটছে তা বেচারারা কিছুমাত্র জানতো না,—তারা তাই উচ্চবাচ্য না করে অস্ত্রসমর্পণ করলো। আমি তাড়াতাড়ি একজন

লোক পাঠালাম শত্রুদের বন্দী স্কোয়াড লীডারকে প্রথম ব্যাটালিয়নের দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভাবছিলাম ওর কাছ থেকে জেনে নৌকোখানির দখল আমরা নিয়ে নিতে পারবো।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে প্রথম ব্যাটালিয়ন নৌকোখানি পেলো—তাই ছিলো নদী পার হওয়ার আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু বিপদ হলো নৌকোর কোনো মাঝি নেই। আমরা কেউই এই ভীষণ স্রোতের মুখে নৌকো চালিয়ে নেওয়ার ভরসা পাচ্ছিলাম না। নদী পেরোনোটা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলো। ঐ রাতে কিন্তু একবারও চোখ বুঁজতে পারলাম না। আনগুনচাং-এর রাস্তার শেষে এই ছোট্ট ঘরখানিতে পায়চারি করতে লাগলাম—কী করে নদী পেরোনো যায় তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। এখনই নদী পার হতে পারলাম না বলে খুব খারাপ লাগছিলো।

জানালা খুলে দিলাম—রাতের হাওয়া এসে ঢুকতে লাগলো ঘরখানিতে। বাইরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—মাঝে মধ্যে এক আধটা গুলি-গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। কালো মেঘগুলো সরে গেছে—মলিন একখণ্ড চাঁদ আকাশে। নদীর ওপর পারের পাহাড়টি দেখাই যাচ্ছিলো না ভালো করে।

বার বার প্রশ্ন করতে লাগলাম নিজেকে: "এই বিরাট দুরন্ত নদী পার হই কেমন করে?"

জানলা দিয়ে মাথা বাইরে বের করলাম। নিশীথ অন্ধকার রাত। হাজার রকম প্রশ্ন মনে জাগতে লাগলো। ডিভিশন্যাল কমাণ্ডারের নির্দেশ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু দুর্ভাবনা করে লাভটা কী? কাল পর্যন্ত সময় আছে হাতে। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

ভোর হয়ে এলো। চমৎকার আবহাওয়া—নীল আকাশে সাদা মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর দুই তীরের খাড়া পাহাড়গুলোকে আরো অনেক উঁচু দেখাতে লাগলো, তার মাঝ দিয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে দুরন্ত জলরাশি। ফীল্ডগ্লাস চোখে দিয়ে ওপর পারের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেলাম। প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে ফেরীর কাছে একটা ছোটো গ্রাম রয়েছে। আধমানুষ উঁচু একটা বেড়া দিয়ে ঘরবাড়ীগুলো আড়াল করা। ফেরীটির আশে-

পাশে কালো পাথর দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা হয়েছে এখানে ওখানে। সম্ভবতঃ আসল শত্রুসৈন্য গ্রামটিতে আত্মগোপন করে রয়েছে মনে হলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো শত্রুরা পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী এবং নদী পার হয়ে একটা অবস্থান তৈরী করার আগেই যাতে লালফৌজকে তারা নদী পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে এই হলো তাদের প্ল্যান।

এই সুচতুর শত্রুর সঙ্গে কী করে মোকাবেলা করবো? ঠিক করলাম: "যে এগিয়ে গিয়ে আগে আঘাত হানতে পারবে, জয় হবে তারই।"

গোলন্দাজ দলকে নির্দেশ দিলাম—তিনটি কামান ও ক'টি ভারী মেশিনগান জুঁতসই জায়গা দেখে বসাতে। হালকা মেশিনগান নিয়ে আমাদের আক্রমণকারী দল নদীর তীর পর্যন্ত আড়ালে আবডালে এগিয়ে গেলো।

গোলা-গুলি বর্ষণের আয়োজন করা হলো—কিন্তু নদী পেরোনোটা গুরুতর সমস্যা হয়েই রয়ে গেলো।

গতরাতে মনে মনে সব রকম সম্ভাবনা নিয়ে ভেবে দেখেছি। সাঁতরে পার হওয়া অসম্ভব। নদীটি তিনশ গজের বেশী চওড়া। যদি দম ফুরিয়ে আসে তবে দুরন্ত স্রোত একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একটা সেতু বানানোর প্ল্যানও করলাম। কিন্তু স্রোতের গতি সেকেণ্ডে প্রায় চার গজ—একটা কিছু দাঁড় করানো অসম্ভব ব্যাপার—শক্ত খুঁটির সাঁকোর তো কথাই উঠে না। তাই ফেরী নৌকোখানিই হলো একমাত্র ভরসা। আমি প্রথম ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডারকে বললাম—ক'জন মাঝি খুঁজে বের করতে।

আশে পাশের গ্রামগুলো খুঁজে সৈন্যরা প্রায় বারোজন মাঝিকে নিয়ে এলো। তারা কথা দিলো আমাদের পার করে দেবে।

কিন্তু নৌকো তো সবে মাত্র একটি—তাই সবাই তো আর যেতে পারবে না একসঙ্গে। প্রথম ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডারকে বললাম—প্রথম যারা যাবে তাদের বেছে নিতে। সৈন্যরা যখন শুনলো নদী পার হওয়ার জন্য একটা দল বাছাই করা হচ্ছে—তারা কমাণ্ডারকে ঘিরে ধরলো,—আর সবাই প্রথম অভিযাত্রী বাহিনীতে যাওয়ার জন্য দাবী জানাতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে, আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলবে না।

"কী করি বলুন তো?"—ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার আমার পরামর্শ চাইলেন।

আমি সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা খুবই আনন্দিত, অথচ ভীষণ উদ্বিগ্ন ; তাঁরা বীর তাই সবাই প্রথমে যেতে চান বলে আনন্দিত, অথচ এ রকম অনিশ্চয়তা চললে খুবই খারাপ হবে বলে তাঁরা উদ্বিগ্নও।

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে বললাম : "আপনিই ঠিক করে দিন কে কে যাবে।"

তিনি ঠিক করলেন দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের থেকে জন বারো লোককে পাঠাবেন। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের লোকেরা তখন ঘরের সামনে এসে জড়ো হলেন।

চারদিকে সব নিস্তব্ধ ; শুধু নদীর দুরন্ত জলরাশির গর্জন শোনা যাচ্ছিলো।

"শিয়ুং শাং-লিন, সেং ছই-মিং, লিউ চ্যাঙ-ফা, চ্যাং কে-পিয়াও…" এভাবে যাদের নাম করা হচ্ছিলো তারা খুবই আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে উঠছিলেন।

ষোল জনের নাম করা হলো। সুস্থ সবল ঐ লোকদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার সঠিকভাবেই বাছাই-এর কাজটি করেছেন।

হঠাৎ সৈন্যদের মাঝ থেকে একজন এগিয়ে এলেন : "আমিও যাবো! আমাকেও যেতে দিন!" এই কথাগুলো বলতে বলতে তিনি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেলেন। উনি হচ্ছেন দ্বিতীয় কোম্পানীর বার্তা-বাহক।

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার তার দিকে তাকালেন। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন : "তুমিও যাও!" সৈনিকটির আগ্রহ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—তাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক তার চোখের জল মুছতে মুছতে অভিযাত্রীদলটির সঙ্গে চলে গেলেন।

এই আঠারো জন বীর (ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারও তাদের সঙ্গে গেলেন) প্রত্যেকে বড় এক একখানি তলোয়ার সঙ্গে নিলেন, আর নিলেন এক একটা টমিগান, পিস্তল, গোটা ছয়েক করে হাত-বোমা আর কিছু কিছু টুকটাক হাতিয়ার-পাতি। তারা দুটা দলে ভাগ করে নিলেন নিজেদের। একদলের নেতৃত্ব নিলেন দ্বিতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডার শিয়ুং শাং-লিন—এবং এই দলটিই প্রথমে পার হবেন ঠিক হলো।

দুরন্ত তাতু নদীর জল প্রচণ্ড বেগে গর্জন করে ছুটে চলেছে। আমি বিপরীত পারের শত্রুদের দিকে আমার ফীল্ডগ্লাস দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। ওদিকে সব কিছুই চুপচাপ।

পরম মুহূর্তটি এসে গেছে। শিয়ুং শাং-লিন এবং তাঁর দলের অন্য সাতজন নৌকায় লাফিয়ে উঠে গেলেন।

"কমরেডগণ, লালফৌজের একলক্ষ সৈনিকের জীবন আপনাদের ওপর নির্ভর করছে। দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলুন এবং শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিন।"

উৎসাহ-ধ্বনির আন্তরিক উল্লাসের মধ্যে নৌকো দক্ষিণ পারের দিকে রওয়ানা দিলো।

স্পষ্টতঃ অধৈর্য হয়েই শত্রুরা নৌকোর দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

"ওদের আচ্ছা করে বুঝিয়ে দাও।"

আমাদের গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণ শুরু করলো। আমাদের চৌকস গোলন্দাজ চাও চ্যাঙ-চেং তার কামানটি সাজিয়ে নিয়ে দুম দুম করে গোলাবর্ষণ শুরু করলেন। শত্রুর রক্ষাব্যূহগুলো গোলার আগুনে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেতে লাগলো। আমাদের মেশিনগান ও রাইফেল থেকেও গুলিবর্ষণ শুরু হলো। লক্ষ্যভেদকারী সৈনিকেরা অভিযাত্রীদের চেয়ে অনেক বেশী তৎপরতা সহকারে একটানা গুলিবর্ষণ করে চললেন। শত্রুর রক্ষাব্যূহে অজস্র গোলাগুলি বর্ষিত হতে লাগলো—মেশিনগ্যানের গুলিতে ওপর পারে তখন আগুনের হলকা ছুটছে। ওদিকে নৌকোর মাঝিরা প্রাণপণে বৈঠা চালাতে লাগলেন।

নৌকো এগিয়ে চলেছে ঢেউএর দোলায় প্রচণ্ড দোল খেতে খেতে। তার চারপাশে গুলি এসে পড়ছে—জল ছিটকে ওদের গায়ে পড়ছে। তীরে দাঁড়ানো আমাদের প্রত্যেকের চোখ জলে ভরে উঠছে আমাদের বীর অভিযাত্রী-দের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

হঠাৎ শত্রুর একটা প্রকাণ্ড গোলা এসে ঠিক নৌকোর পাশেই পড়লো—একটা বিরাট ঢেউ লাফিয়ে উঠলো—নৌকো দুলে উঠলো প্রচণ্ডভাবে।

"সব শেষ!" আমার প্রাণটা মুচড়ে কেঁদে উঠলো। নৌকোখানি ঢেউয়ের দোলায় বারবার উঠতে ও পড়তে লাগলো। যাক তার পরে তা আবার সোজা চলতে লাগলো। আমার প্রাণটা যেন ফিরে এলো।

নৌকো এগিয়ে চললো ওপর পারের দিকে। নৌকো প্রায় পাঁচ ছয় গজের মধ্যে এসে পড়েছে। আমাদের অভিযাত্রী সৈনিকেরা নৌকোর গলুই-এর দিকে এগিয়ে চললেন—তাঁরা তখন লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরী।

হঠাৎ একটা হাতবোমা ও মাইন উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছিলো,—প্রচণ্ড শব্দে তা মাঝপথে বিস্ফোরিত হলো—আর চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সাদা রঙের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো। মনে হলো শত্রুরা যথার্থই একটা হামলা শুরু করতে চলেছে। আমি ফীল্ডগ্লাস দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—যা ভেবেছি তাই; পাশের গ্রামটি থেকে দলে দলে শত্রুসৈন্যরা বেরিয়ে আসছে। আমাদের মুষ্টিমেয় ক'জনের বিরুদ্ধে ওরা প্রায় দু'শ লোক ছুটে আসছে। আমাদের লোকেরা এক অসম্ভব অবস্থায় পড়বেন—পেছনেই প্রচণ্ড নদী। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

"গুলি ছুঁড়তে শুরু করো,"—আমাদের গোলন্দাজদের আদেশ দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দু'টো কানফাটানো শব্দ হলো। চাও চ্যাঙ-চেং এর ছোঁড়া মর্টার দুটো একেবারে শত্রুপক্ষের মাঝখানে গিয়ে ফেটে পড়লো। আমাদের ভারী মেশিনগান থেকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে শত্রুদের লক্ষ্য করে।

"চালিয়ে যান, ওদের আচ্ছা করে শিক্ষা দিন!"

ওপর পারে নদীর ঢাল থেকে জয়ধ্বনির চীৎকার শুনতে পেলাম। শত্রুরা তখন বেতাল হযে প্রাণহাতে করে ছুটে পালাচ্ছে।

"চালান, গুলি চালান!" —বলে আদেশ দিলাম।

নূতন করে গুলি-গোলা পড়তে লাগলো শত্রুদের ওপর। আমাদের অভিযাত্রী সৈন্যরা তখন নৌকা থেকে লাফিযে পড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন—গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে চলেছেন। শত্রুরা পিছু হটলো। ফেরীঘাটের রক্ষাব্যূহ আমাদের লোকেরা দখল করে নিয়েছেন ততক্ষণে;—শত্রু কিন্তু তখনও আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

নৌকাখানি দ্রুত ফিরে এলো। অন্য আটজন অভিযাত্রী সৈন্য ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের নেতৃত্বে নৌকায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

"যতো দ্রুত সম্ভব নৌকা চালিয়ে নিয়ে যান, ওপর পারের কমরেডদের

সাহায্যে এগিয়ে যান !" —ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার তাঁর সঙ্গীদের বললেন শুনতে পেলাম।

নৌকো রওয়ানা দিলো এবং যথাসম্ভব দ্রুত অপর পারের দিকে ছুটে চললো। শত্রুরা পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে গোলাগুলি ছুঁড়ে এই দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির অবতরণ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছিলো। ভীষণভাবে ওরা গোলাগুলি ছুঁড়েই চলেছিলো নৌকোটিকে লক্ষ্য করে।

ছোট্টো নৌকোখানি ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে অবিরাম বর্ষিত গোলাগুলির মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলো।

পারের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে এমন সময় শত্রুরা মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকেপ্রচণ্ড গুলি বর্ষিত হতে লাগলো নৌকাকে লক্ষ্য করে। ফীল্ডগ্লাস দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের একজন সৈনিক তাঁর হাত চেপে ধরেছেন। নিশ্চয়ই ওর হাতে গুলি লেগেছে।

"কেমন আছেন বেচারা ?" —ভাববার সময় ছিলো না। নৌকো আরো কয়েক গজ এগিয়ে গেলো। এমন সময় প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো—জলের নীচের একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে নৌকাখানি আটকে গেলো।

"খুবই খারাপ কথা !" নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম মাঝিরা একটা পাথর আঁকড়ে রয়েছে—। চারদিক থেকে জল ফুঁসে ফুঁসে নৌকোর মধ্যে আছড়ে পড়ছে—নৌকোখানি তলিয়েই যাবে মনে হলো। যদি নদীর ঢেউ তাকে তীব্র স্রোতের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায় তবে তা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ডুবে যাবে।

মনে হচ্ছিলো আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে।

চারজন মাঝি জলে ঝাপিয়ে পড়লো—জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে তাকে টেনে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করলো আর অন্য চারজন প্রাণপণে লগি ঠেলছিলো। নৌকোটাকে ছাড়ানো গেলো এবং ধীরে ধীরে তা' এগিয়ে চললো। চারদিকে সোঁ সোঁ করে গুলি চলছে। প্রতিটি মিনিট কাটতে লাগলো প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে—আধ ঘণ্টায় খানিকটা এগোনো গেলো—প্রায় এক ঘণ্টার প্রাণপণ চেষ্টার পর অবশেষে নৌকো পারে পৌঁছতে পারলো। আমার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো !

ওপর পারের পাহাড়ে অবস্থিত শত্রুদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো

গোলাগুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বিউগল হাঁকিয়ে তারা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে হাতবোমা ছুড়ছে

শত্রুপক্ষকে দমিয়ে রাখার জন্য গোলাগুলি বর্ষণ অব্যাহত রাখার আদেশ দিলাম : "গোলাগুলি বর্ষণ করেই চলুন !"

ওপর পারকে লক্ষ্য করে আমাদের গোলাগুলি বর্ষণ অব্যাহতভাবেই চলতে লাগলো। শত্রুদের তাঁক করেই আমাদের সৈন্যরা গুলি ছুড়ছিলো। শত্রু-সৈন্যরা অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলো।

অভিযাত্রী দুটি দল মিলিয়ে আমাদের আঠারো জন সৈন্য একত্রে তখন শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। হাতবোমা ছুঁড়ে, টমিগান থেকে গুলি ছুঁড়ে এবং তলোয়ার উঁচিয়ে ওরা তখন এগিয়ে চলেছেন। প্রচণ্ড মার খেয়ে শত্রুরা তখন পাহাড়ের আড়ালের দিকে ছুটে চলেছে। উত্তর পার পুরোপুরি আমাদের অভিযাত্রী বাহিনীটির নিয়ন্ত্রণে চলে এলো।

কিছুক্ষণ পরে নৌকো আমাদের পারে ফিরে এলো। এবার আমি ক'টি ভারী মেশিনগান সহ অপর পারের রক্ষা-ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য একটি দল নিয়ে রওয়ানা হলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লালফৌজের দলগুলো একের পর এক নিরাপদে নদী পার হতে লাগলো। শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে আমরা আরো দু'খানি নৌকো দখল করে নিলাম – ফলে নদী পেরোবার কাজটা দ্রুত গতিতেই চলতে লাগলো। পরদিন দুপুরের মধ্যে পুরো রেজিমেণ্টটি নদী পার হয়ে গেলো। প্রথম লাল রেজিমেণ্টের এভাবে তাতু নদী পার হয়ে যাওয়ার ফলে বাম দিক থেকে লুটিং ব্রীজ দখল করার জন্য যে বাহিনীটি এগিয়ে চলেছিলো তাদের খুবই সুবিধে হলো। এই আঠারো জন বীরের তাতু নদী অতিক্রম করার এই দুর্জয় অভিযান—আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসের অন্যান্য বহু গৌরবময় কাহিনীর মতোই চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লুটিং সেতু জয়ের সংগ্রাম

জেনারেল ইয়াংচেং-উ

১৯৩৫ সালের মে মাসে লং মার্চের গতিপথে লালফৌজ সেচুয়ান ও সিকাং প্রদেশের সীমান্তবর্তী তাতু নদীর তীরে এসে উপনীত হয়। ২২শে মে লালফৌজের প্রথম রেজিমেন্ট সাফল্যের সঙ্গে আনশুনচাং-এ তাতু নদী পার হতে সমর্থ হয় কিন্তু নদীতে স্রোত এমন তীব্র ছিলো যে ওখানে কোনো ধরনের সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ছোট তিনখানি নৌকোই ছিলো পারাপার হওয়ার একমাত্র সম্বল। প্রতিবার নদী পারাপার করতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগছিলো। বেশ কয়েক হাজার সৈন্যের এভাবে নদী পার হতে অনেক দিন লেগে যেতো।

চিয়াং কাই-শেক তার বিশ্বস্ত সেনাপতি লিউ উয়েন-হুই ও ইয়াং সেন-এর অধীন সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন আমাদের নদী পার হওয়া ঠেকাবার জন্য আর অন্য সেনানী স্যুয়ে ইয়ে এবং চৌ হুন-য়ুআনকে হুকুম দিয়েছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে পেছন থেকে হামলা চালাবার জন্য। এক শ' বছর আগে তাইপিং বিপ্লবের বিখ্যাত সেনাপতি শী তা-কাই এবং তাঁর সৈন্য বাহিনী আনশুনচাংয়েই মাঞ্চু সৈন্যদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। চিয়াং কাইশেকও মনে মনে কল্পনার জাল বুনছিলেন যে লালফৌজেরও সেই একই হাল তিনি করে ছাড়বেন। সমগ্র চীনের জনগণই এই পরিণতির কথা ভেবে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। লালফৌজ কি শী তা-কাইএর পরিণতির পথেই যাবে শেষপর্যন্ত? ঐতিহাসিক ঐ বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তিই কি হতে চলেছে?

দ্রুত নদী পার হয়ে যাওয়া এবং শত্রুর সাঁড়াশি অভিযান ব্যর্থ করার জন্য অবিলম্বে লুটিং সেতুটি দখল করে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। বাম দিক থেকে এগিয়ে চলা সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী চতুর্থ লাল রেজিমেন্টটির ওপর এই গুরুভার কর্তব্যটি ন্যস্ত করেছিলেন জেনারেল লিন পিয়াও। সৈন্য বাহিনীর চীফ-অফ-স্ট্যাফ লিউ পো-চেং এবং পলিটিক্যাল কমিশার নী জুং-চেন-এর পরিচালনাধীনে প্রথম লাল ডিভিশন আনশুনচাং-এ নদী পার হয়ে পূর্বতীর

ধরে উত্তরমুখে এগিয়ে যাচ্ছিলো লুটিং সেতুর ওপর দিক থেকে চতুর্থ রেজিমেণ্টকে সাহায্য করার জন্য।

*　　　*

২৮শে মে ভোরে আমি আমাদের রেজিমেণ্টকে নিয়ে আনশুনচাং থেকে রওয়ানা হলাম প্রায় একশ মাইল দূরবর্তী লুটিং সেতুর দিকে নদীর পশ্চিম তীর ধরে। তিন দিনের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে পৌছবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের। পর্বতসংকুল এলাকার মধ্য দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো উঁচু নীচু পথ,—চড়াই-উৎরাই ভরা। বা দিকে পাহাড় উঁচু খাড়া হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠেছে—যেন কেউ ছুরি দিয়ে কেটে রেখেছে। উঁচু পাহাড়গুলো যেন আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। পাহাড়ের মাথায় জমাট-বাঁধা বরফ থাকে সারা বছর ধরে। সাদা ঝকঝকে বরফে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর আবহাওয়া ভীষণ রকম কনকনে ঠাণ্ডা। ডান দিকে কয়েক কুড়ি গজ নীচে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে নদীর সফেন জলরাশি। সামান্য এদিক ওদিকে পা পড়লেই নদীর অতলে হারিয়ে যেতে হবে! কিন্তু এসব বিপদ নিয়ে ভাবার তখন কারো সময় ছিলো না আমাদের। সবার মনেই একটি মাত্র ভাবনা: জোর কদমে এগিয়ে চলো! লুটিং সেতু আমাদের দখল করতেই হবে!

মাইল দশ এগিয়ে চলার পর নদীর ওপর পারের শত্রুসৈন্যরা আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। অকারণ ক্ষয়ক্ষতি পরিহার করার জন্য আমরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রায় চার মাইল আকাবাঁকা পথ ঘুরে এলাম। তাতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় অপচয় হলো।

প্রায় কুড়ি মাইল পার হওয়ার পর আমরা বিরাট একটা পাহাড়ের মুখোমুখী হলাম। ওখানে আমাদের সৈন্যরা প্রায় এক কোম্পানী শত্রুসৈন্যকে দেখতে পেয়ে বাঘের মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জোরদার একটি সংঘর্ষের পর শত্রুদলকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম।

পাহাড়টা ছিলো প্রায় চার মাইল উঁচু। অন্যদিকে ছলো একটা পাহাড়ী নদী—খুব চওড়া নয় কিন্তু, ভীষণ গভীর। শত্রুরা সেতুটি ভেঙ্গে ফেলেছে—নদী পার হওয়া তাই একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমরা কয়েকটি গাছ কেটে নদীর ওপর ফেলে একটা সাঁকো বানিয়ে নিলাম এবং নদী পার হলাম।

এই প্রথম-বিজয়ে আনন্দিত হয়ে—আমরা নূতন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চললাম। সামনে থেকে মাঝেমধ্যে শত্রুরা গুলিগোলা ছুড়ছিলো। হঠাৎ আমাদের একজন স্কাউট ছুটে এসে খবর দিলো : "আমাদের সামনে বা দিকে একটি গিরিপথ রয়েছে। ওপর থেকে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন শত্রুসৈন্য তা পাহারা দিয়ে রেখেছে। তারা আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

তখনই রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে দু'জন করে লাইন করে ক'জন সৈন্যকে নিয়ে আমি পাহাড়ি ঐ পথ ধরে স্কাউটটির সঙ্গে চললাম। সামনে দুধারে পাহাড় একেবারে খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে—তার মাঝ দিয়ে ছোট একটি পথ—পথটা এমন খাড়া হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছিলো যেন সিড়ি বেয়ে স্বর্গে উঠতে যাচ্ছি। সামানের পথের দিকে তাকালে আপনার মাথার টুপিটি খুলে পড়ে যাবার জোগাড় হবে। পাহাড়ের চূড়ায় শত্রুরা দুর্গ স্থাপন করেছে—আর গিরিপথের মাথায়ও তারা শক্ত একটা ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

ডাইনে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী—তাই পাহাড়টিকে যে পাশ কাটিয়ে যাবো তারও উপায় নেই। সামনের খাড়াইটা প্রায় অনতিক্রম্য। বা দিকে খাড়া চড়াই এর গায়ে এখানে ওখানে নানা ঝোপঝাড়। খাড়াই এর মাথা থেকে পাহাড়টা উঠে গেছে সোজা ওপরের দিকে।

ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে আমরা ঠিক করলাম একটা দলকে পাঠিয়ে বা-দিক দিয়ে ঘুরে এসে তা যাতে শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং এভাবে গিরিপথটি দখল করে নেওয়া। একটি দল যখন বা পাশ থেকে পাহাড়ে চড়তে এগিয়ে আসবে, আমাদের তৃতীয় ব্যাটালিয়ন তখন প্রত্যক্ষ আক্রমণের ভাণ করতে থাকবে। শত্রুপক্ষ মেশিনগান দিয়ে এমন প্রচণ্ড একটা প্রতিরোধ রচনা করে রেখেছে যে একটা মশা মাছির পক্ষেও ঐ গিরিপথ দিয়ে গলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর পেছন থেকে আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। তৃতীয় ব্যাটালিয়ন তখন পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করলো এবং শত্রুদের তাদের ঘাঁটি থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। আমরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম, গিরিপথের পাদমূলেই শত্রুদের তিনটি কোম্পানীকে ধ্বংস করে দিতে পারলাম। একজন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ও একজন কোম্পানী

কমাণ্ডার সহ দুই শতাধিক শত্রুসৈন্য আমাদের হাতে বন্দী হলো।

পরদিন আমরা নিম্নলিখিত আদেশ পেলাম: "বাঁ-দিক থেকে অগ্রসরমান আমাদের সেনাবাহিনীকে লুটিং সেতু দখল করে নেওয়ার জন্য ২৫শে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। আপনাদের চূড়ান্ত, প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই গৌরবময় কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে আপনারা তা সুসম্পন্ন করতে পারবেন। আপনাদের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি।" আদেশটির নীচে জেনারেল লি পিয়াও-এর স্বাক্ষর রয়েছে দেখতে পেলাম।

আদেশটি পড়া শেষ করে কমাণ্ডার ওয়াং ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলাম: "খুবই গৌরবের কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য!"

পরের দিনই হচ্ছে ২৫শে! অথচ আমরা লুটিং সেতুর লক্ষ্যস্থল থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে রয়েছি। দুদিনের পথ একদিনে পাড়ি দিতে হবে আমাদের! আমাদের যাত্রাপথের পরিকল্পনা এতো দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাবে বা তাকে এমন জরুরী করে তোলা হবে তা আমরা কেউ ভাবিনি। প্রায় ৮০ মাইল পথ একদিনে পাড়ি দেওয়া এক সাংঘাতিক কাজ—অথচ পায়ে হেটে এই গোটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে! তাছাড়া শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই আমাদের পথ করে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো।

কিন্তু আদেশ আদেশই। কাজটা পরম গৌরবের এবং তা কার্যকর আমাদের করতেই হবে। একটি মুহূর্তও নষ্ট করার, দেরী করার উপায় নেই আমাদের। সময়ই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার। আগে শত্রুপক্ষের দুটো রেজিমেণ্ট সেতুটি আগলাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা নিজেরাই দেখতে পেলাম নদীর ওপর পার দিয়ে শত্রুপক্ষের দুটো ব্রিগেড দ্রুত সেতুর রক্ষীদলকে জোরদার করতে ছুটে চলেছে। ঐ ব্রিগেড দুটোর কিছু সৈন্যকে রেখে যাওয়া হয়েছে আমাদের প্রথম লাল ডিভিশনের এগিয়ে চলার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য; —আমাদের প্রথম ডিভিশন আনশুনচাং-এ নদী পার হয়ে সেতুর দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। আমরা যদি ওখানে প্রথমে পৌঁছে যেতে পারি—তবে আমাদেরই জয়ের সম্ভাবনা। অন্যথায় লুটিং সেতু দিয়ে

লালফৌজের নদী পার হওয়া অসম্ভব না হলেও রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের দাঁড়ানোর সময় ছিলো না। সময়ের দাম অনেক। এগিয়ে চলতে চলতেই আমরা মিলিটারী ও রাজনৈতিক অফিসারদের একটি সভা করে নিচ্ছিলাম আমাদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে। আমরা প্রথমেই কটি জরুরী আহ্বান ঘোষণা করলাম: "চতুর্থ লাল রেজিমেণ্টের রয়েছে এক গৌরব-দীপ্ত অতীত। যথাসময়ের মধ্যে আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতেই হবে এবং আমাদের গৌরব অম্লান রাখতেই হবে!" "আনশুনচাং-বিজয়ী প্রথম লাল রেজিমেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন! তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে লুটিং সেতুর দিকে আমরা এগিয়ে যাবো!" "আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব খুবই গৌরবের—কিন্তু তা এক সুকঠিন কর্তব্য। এই গুরুভার কর্তব্য সুসম্পন্ন আমরা করবোই!" পরদিন সকাল ছটার মধ্যে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করলাম। সভার পর অফিসারগণ তাদের নিজ নিজ বাহিনীতে ফিরে গেলেন তাদের লোক-জনদের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

সভার কাজ শেষ হতে না হতেই 'পাগলা-বাঘের-পাহাড'টি সামনে দেখা গেলো।

এই 'পাগলা-বাঘের-পাহাড' পার হওয়ার জন্য প্রায় তেরো মাইল খাড়াই বেয়ে উঠতে হবে এবং প্রায় সেই পরিমাণ পথ নেমে আসতে হবে। এই খাড়াই বেয়ে ওঠা এক চরম বিপজ্জনক কাজ, ডান দিকে রয়েছে ভয়ঙ্কর তাতু নদী, বা দিকে উঁচু পাহাড় আর পথ হচ্ছে আঁকাবাঁকা আর একান্ত সংকীর্ণ। লোকে বলে পথটা হচ্ছে আনশুনচাং আর লুটিং সেতুর মধ্যেকার সর্বনাশা গিলে-খাওয়ার চিকন-গলা, কথাটার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়িই নেই।

পাহাড়ের মাথায় যেখানে পথটা নীচের দিকে নেমে গেছে সেখানে শত্রু-পক্ষের একটি ব্যাটালিয়ন পথরোধ করে রয়েছে। সময়টা ছিলো সর্বাপেক্ষা কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের দিন। পাঁচ ছয় হাত দূরের জিনিসও ভালো দেখা যায় না। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছি এমন সময় শত্রুরা আমাদের দেখে ফেললো, কিন্তু কুয়াসার জন্য তারা ভালো করে আমাদের দেখতে পাচ্ছিলো না। তারা আন্দাজে অন্ধকারে গুলি ছুড়ছিলো। প্রাকৃতিক অবস্থার এই সুযোগ নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের লোকদের গুলিছোড়া

বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলাম। ওদের কাছাকাছি যখন এসে পড়লাম—আমরা হাতবোমা ও বেয়নেট দিয়ে আক্রমণ শুরু করলাম। কুয়াশার মধ্যে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো—আর আমাদের সৈন্যদের উল্লাসধ্বনি ভেসে আসছিলো। ভয় পেয়ে শত্রুসৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। আমাদের অগ্রগামী বাহিনীটি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো পাহাড়ের ওপর দিক দিয়ে, শত্রুসৈন্যের অনেকেই বন্দী হলো এবং তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়লো। শুধু গুলিগোলা ও রাইফেলই নয়—প্রচুর ভালো ময়দাও পাওয়া গেলো। শত্রুসৈন্যদের তাড়িয়ে আমাদের অগ্রসর বাহিনী মশিমিয়েন গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো—কিন্তু ওখানে শত্রুদের একটি ব্যাটালিয়ন ছিলো—এবং ঐ গ্রামটিই ছিলো ওদের রেজিমেন্টের সদর দপ্তর। আমাদের অগ্রগামী বীর সৈনিকেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শত্রুদের ছত্রখান করে দিলো। আমরা মশিমিয়েন গ্রামটি দখল করে নিলাম।

শত্রুপক্ষ বদমায়েসী করে গ্রামের পূর্বপ্রান্তের একটি সেতু ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে। ফলে আমাদের পথে আরেকটি নূতন বাধা সৃষ্টি হয়েছে। দু'ঘণ্টা ধরে সেতুটি মেরামত করে আমরা এগিয়ে চললাম। কোনো বিশ্রাম না নিয়ে আমরা একটানা সতেরো মাইল অতিক্রম করে এসেছি। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তাতু নদীর পারে দশ বারোটি পরিবার অধ্যুষিত একটি ছোটো গ্রামে আমরা এসে পৌছলাম। লুটিং পর্যন্ত যেতে এখনও প্রায় চল্লিশ মাইল বাকী।

বিপদ কখনো একা আসে না। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা তো আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নয়। হঠাৎ বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। আকাশ এমন অন্ধকার হয়ে উঠলো যে নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো না। সারাদিন আমাদের লোকজনদের কিছুই খাওয়া হয়নি। ক্ষুধায় তখন সবাই কাতর। রাত্রির অন্ধকারে পিচ্ছিল পথ ধরে হেঁটে চলা ছিলো এক কঠিন ব্যাপার, আমাদের খাদ্য ও মালপত্রবাহী পশুগুলো আর চলতেই পারছিলো না। "পাগলা বাঘের পাহাড়" থেকে নেমে আসতে আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম ওপর পার দিয়ে শত্রুসেনারা আমাদের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। তারা যদি আমাদের আগে সেতু পর্যন্ত পৌছে যায় তবে আর আমাদের রক্ষা থাকবে না। অবিলম্বে একটা পথ আমাদের বের করতেই হচ্ছিলো—বিলম্বের কোনো সুযোগই ছিলো না।

সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ জোরদার করে তুলতে হচ্ছিলো। আমরা আমাদের সকল কমিউনিস্ট, যুবলীগ কর্মী ও অন্যান্য উৎসাহী কর্মীদের কাছে একটি আহ্বান রাখলাম, তাদের কাছে স্পষ্ট করে আমরা আমাদের সামনেকার বিপদ ও অসুবিধা সম্পর্কে বললাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম: আগামীকাল সকাল ছ'টার মধ্যে লুটিং সেতুতে আমদের পৌছতেই হবে। সকলকে বলা হলো প্রত্যেকেই যেন একটি লাঠি জোগাড় করে নেন, দরকার হলে যারা আর হাঁটতে পারছেন না তারা লাঠিভর দিয়ে চলতে পারেন। যারা লাঠিভর দিয়েও চলতে পারবেন না তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারেন—কিন্তু যেমন করেই হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে আমাদের পৌছতেই হবে! রান্নার জন্য অপেক্ষা করার সময়ও আমাদের ছিলো না। সবাইকে বলা হলো তারা যেন তাদের বরাদ্দ চাল চিবিয়ে খেয়ে নেন—এবং না-ফোটানো জলই গিলে নেন।

এই আহ্বানটি সারা বাহিনীর মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো এবং সৈন্যদের সংগ্রামী প্রেরণাকে প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিলো। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ছুরি দিয়ে তৈরী পাহাড় অতিক্রম করতে হলেও তাদের গতিরোধ করা যাবে না। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল এই পথ ধরে প্রায় ৩৮ মাইল পথ কী করে পাড়ি দেওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নটি একটা প্রচণ্ড দুর্বহ বোঝার মতো আমাকে চেপে ধরছিলো।

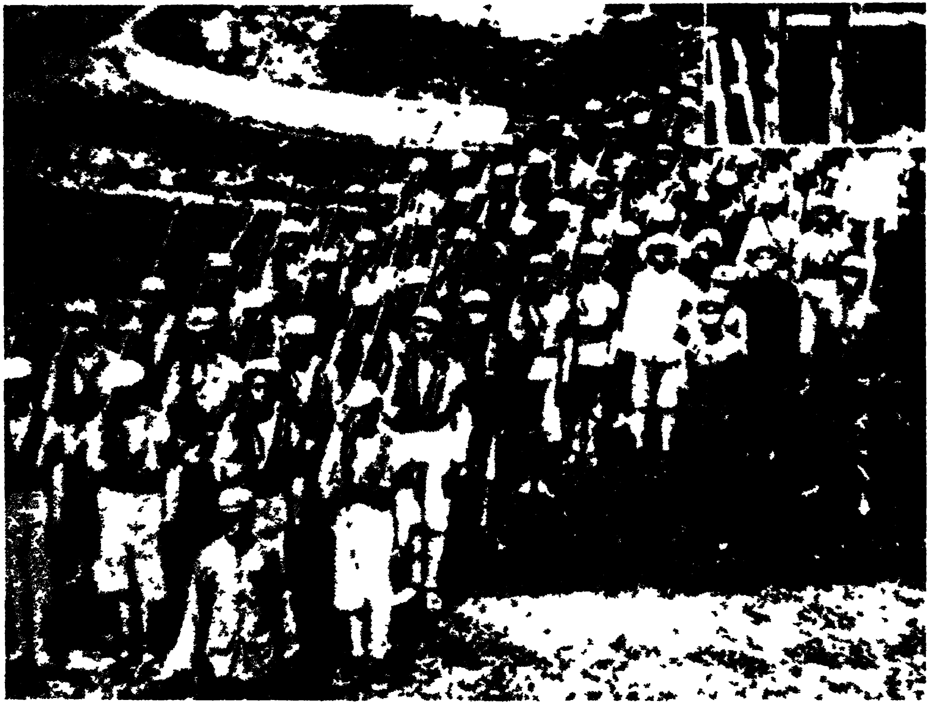
হঠাৎ নদীর ওপর পারে ক'টি আলোর বিন্দু চোখে পড়লো—পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো মশাল জ্বালিয়ে শত্রুরা এগিয়ে চলেছে বোঝা গেলো। তা' থেকে একটা ধারণা পাওয়া গেলো। ভাবলাম, আমরাও তো তাই করতে পারি। অবিলম্বে রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার, চীফ-অফ-স্টাফ এবং পার্টি সম্পাদকের সঙ্গে কথা বললাম। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিলো: আমরাও যদি এভাবে মশাল জ্বালিয়ে চলতে থাকি তবে নদীর ওপর পারের শত্রু সৈন্যরা আমাদের হদিস পেয়ে আমাদের পরিচয় জানতে চাইতে পারে। তখন? তারা যদি আমাদের চিনে ফেলে এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে যথাসময়ে আমাদের পক্ষে সেতু পর্যন্ত পৌছা সম্ভব হবে কি?

"সমস্যা যখন সবচেয়ে জটিল, তখনই সবচেয়ে সাহসের সঙ্গে কাজ করা দরকার।" ঠিক করে নিলাম,—গতকাল এবং আজ যে তিনটি শত্রুপক্ষের



দুরতিক্রম্য
তাতু নদীর
ওপরে লোহার শিকল
দিয়ে তৈরী ঝুলন্ত লুটিং সেতু।

‘লুটি’ সেতুকে’ ঘিরে ধরে আছে পর্বত অতি উচ্চ,
আকাশেরে ছুঁয়ে দম্ভে তাহারা মেঘেরে করেছে তুচ্ছ।



সুদীর্ঘ নয় হাজার মাইল
লং মার্চের শেষে
উত্তর শেনসির মুক্ত অঞ্চলে
লালফৌজের প্রবেশের ঐতিহাসিক দৃশ্য।

ব্যাটালিয়ন ধরা পড়েছে তাদের পরিচয় চিহ্ন ব্যবহার করবো আমরা। গ্রামের লোকজনদের কাছ থেকে খড় ও বাঁশের কাঠি আমরা যা পেলাম কিনে নিলাম। কাঠিগুলোর মাথায় খড় জড়িয়ে আমরা মশাল বানিয়ে প্রত্যেককে একটি করে দিলাম। এগিয়ে চলার সময় প্রতিটি স্কোয়াডকে একটি করে মশাল জ্বালাতে বলা হলো—মশালগুলো অনর্থক নষ্ট করতে মানা করে দেওয়া হলো। প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন মাইল যেতে হবে বলে ঠিক করে নেওয়া হলো, আমাদের বিউগলবাদকদের নির্দেশ দেওয়া হলো ধৃত শত্রুদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ী শত্রুপক্ষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য। লিউ উয়েন-হুই এর সৈন্যরা সবাই ছিলো সেচুয়ানের অধিবাসী। আমরা আমাদের মধ্য থেকে ক'জন সেচুয়ানবাসী খুঁজে বের করলাম আর বন্দীদের মধ্য থেকেও ক'জন ঠিক করলাম। উদ্দেশ্য হলো ওপর পার থেকে শত্রুপক্ষ কোনো প্রশ্ন করলে তার ঠিক ঠিক জবাব তক্ষণি দিয়ে দেওয়া।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলার জন্য, আমরা আমাদের ভারবাহী পশু, লটবহর, ভারী অস্ত্রপাতি সবই দু'জন অফিসারের পরিচালনাধীনে একটি প্ল্যাটুনের ওপর রেখে এসেছি। আমার এবং কোম্পানী কমাণ্ডারের ঘোড়া দু'টিও রয়েছে ওদের সঙ্গে। তাদের বলা হয়েছে তারা যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসার জন্য যেন চেষ্টা করেন।

আমার পায়ে একটা চোট লেগেছিলো ক'দিন আগে—এখনও সারেনি। হেঁটে চলার সময় বেশ অসুবিধা হচ্ছিলো। কমরেডরা বিশেষ করে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে চলার জন্য। কিন্তু এই কঠিন সময়ে যখন অফিসারদের কাজ হলো আদর্শ স্থাপন করা তখন আমি ঘোড়ায় চড়ে চলি কেমন করে? আমি সঙ্গীদের বললাম—"কমরেডগণ, সবাই আমরা একসাথেই চলবো। দেখা যাক কে সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারে, দেখা যাক কে সবার আগে লুটিং সেতুতে পৌছতে পারে!"

কথাটা শুনে খুশি হয়ে আমাদের সৈন্যরা মশাল জ্বালিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলতে লাগলো।

দুই পারে আমাদের ও শত্রুসৈন্যদের মশালগুলো একই সঙ্গে জ্বলছিলো। তাতু নদীর জলে মশালের ছায়া পড়ে নদীর জল কেমন যেন লাল দেখাচ্ছিলো। দূর থেকে জ্বলন্ত মশালের এই দু'টিসারিকে অনল-নিঃশ্বাসী দুটো ড্রাগনের

মতোই দেখাচ্ছিলো। মাঝখানে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড গর্জনের কোলাহল তুলে প্রমত্ত তাতু নদী। শত্রুরা হঠাৎ বিউগলের তীব্র একটা আওয়াজ তুললো আর তারপর জানতে চাইলো: "তোমরা কোন্ ইউনিটের?"; বোঝা গেলো, শত্রুরা আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইছে।

আমাদের বিউগলবাদকরা শত্রুদের নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলো এবং আমাদের সেচুয়ানবাসী কমরেডরা বন্দী সেচুয়ানী সৈন্যদের সঙ্গে সমন্বয়ে তাদের আশ্বস্ত করে জবাব দিলো। ওপারের বোকা পাঁঠাগুলো আন্দাজই করতে পারেনি যে নদীর এপার দিয়ে দিনরাত ছুটে চলেছে সাহসী লালফৌজের সৈন্যরা—যাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা দিনরাত স্বপ্ন দেখছে! পাশাপাশি এভাবে প্রায় দশ মাইল এগোলাম আমরা। মাঝ রাতের দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো আর অপর পারের মশালগুলো নিবে গেলো। আমরা বুঝলাম যে তারা একান্ত ক্লান্ত হয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোটা রেজিমেণ্টে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের কমরেডদের তখন কী আনন্দ! তারা বললেন: "এই হচ্ছে সুযোগ! চলুন, জোরকদমে সবাই এগিয়ে চলি!" এক লাইন হয়ে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে চললাম।

এদিকে একটানা অসহ্য বৃষ্টিপাত চলছে, পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নদীতে পড়ছে। নদীর পার ধরে আঁকাবাঁকা পথে এগোনো আগের চেয়েও কঠিন হয়ে পড়লো—সারা পথ তেলে-ভেজা পিচ্ছিলতায় ভরে উঠলো। আমাদের হাতের লাঠিগুলোতে বিশেষ সাহায্য হচ্ছিলো না। একটু পা হড়কালেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হচ্ছে। তিন কদম এগোতেই একবার পা হড়কে যাচ্ছে আর চার-পাঁচ কদম দিতে না দিতেই একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে হচ্ছে। আমরা ঠিক মার্চ করছিলাম না—যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিলাম।

এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে চলছিলেন। কেউ ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে পেছনের অন্যজন তাঁকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠছেন: "এগিয়ে চলো কমরেড, এখনও অনেক পথ।" ক্লান্ত সৈন্যটি যেন নূতন বল লাভ করে তখন এগিয়ে চলেছেন। অবশেষে সৈন্যরা তাদের পট্টি খুলে নিয়ে তা দিয়ে একে অন্যকে বেঁধে নিলেন একটা লম্বা শিকলের মতো করে; এভাবে একজন আরেকজনকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলেন।

এ ধরনের অসহ্য একটা অবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে সারারাত ধরে চলতে চলতে পরের দিন ভোর ছটার সামান্য কিছু পরে আমরা লুটিং সেতু পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম এবং সেতুর পশ্চিম প্রান্ত ও পশ্চিম দিকের রাস্তা-ঘাটগুলো দখল করে নিতে পারলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, ভাঙ্গা সেতু মেরামত করা ইত্যাদি বাধা সত্ত্বেও আমরা প্রায় ৮০ মাইল হেঁটে এসেছি! সত্যিকার হেঁটে আসা তো তা নয়, যেন পায়ে পায়ে উড়ে চলে আসার এ এক বিস্ময়কর কীর্তি!

*　　　*　　　*

সেতুর পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটি বাড়ী আমরা দখল করে নিলাম। আমাদের লোকজনেরা তাদের কাপড় চোপড় শুকিয়ে নিতে লাগলেন, সামান্য কিছু রান্নাবান্না করে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার ওয়াং ও আমি ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানী কমাণ্ডারদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলাম পথঘাট দেখে নেবার জন্য।

একটা বিপজ্জনক জায়াগায লুটিং সেতু অবস্থিত। আমরা যারা প্রচণ্ড বিপদের মোকাবেলা করে এসেছি তারাও অবস্থাটা দেখে হতবাক্ হয়ে গেলাম। নীচে বয়ে চলেছে লাল রঙের জলরাশি, পার্শ্ববর্তী উঁচু পাহাড়গুলো থেকে বয়ে আসা জল এসে পডছে নদীতে, বিশালাকৃতি পাথরের গায়ে পড়ে জল অনেক উপরে ছলকে উঠছে। প্রবল বেগে প্রবাহিত জলরাশির গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড। এমন তীব্র স্রোত যে একটা মাছের পক্ষেও জলে ভেসে থাকা অসম্ভব। থাম বসানো সেতু রচনা করা বা নৌকায় করে নদী পার হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। তাই এই লুটিং সেতুটিই হচ্ছে অপর পারে যাওয়ার একমাত্র উপায়।

ভালো করে খুঁটিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলাম। সেতুটি পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরী নয়—তৈরী লোহার শিকল দিয়ে—সব, মিলিয়ে তেরোটি শিকল রয়েছে সেতুটিতে—শিকলের এক একটা চাকতি এক একটা ঝুড়ির মতো বড়ো বড়ো। দুদিকে দু দুটি করে লোহার শিকল দিয়েই রেলিং তৈরী করা হয়েছে—সেতুতে রয়েছে নয়টি শিকল। এই ন'টি শিকলের ওপর তক্তা ফেলে রাস্তা করা হয়েছে আর গোটা সেতুটা দুপাশে দুটো পাহাড়ের সঙ্গে ঝোলানো। লোকজন চলাচলের সময় সেতুটি দোলনার মতো দোল খেতে

থাকে। শত্রুপক্ষ তক্তাগুলো সরিয়ে নিয়েছে পাশের লুটিং শহরে—এখন রয়েছে শুধু ন'টি কালো মোটা ঝোলানো শিকল। সেতুটির মাথায় দু'লাইন কবিতা পাথরে খোদাই করা রয়েছে :

'লুটিং সেতুকে' ঘিরে ধরে আছে পর্বত অতি উচ্চ,
আকাশেরে ছুঁয়ে দম্ভে তাহারা মেঘেরে করেছে তুচ্ছ।

নদীর পূর্বতীরে লুটিং শহর,—শহরের অর্ধেক নদীর তীরে আর বাকী অর্ধেক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। প্রায় পনেরো হাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শহরটি একেবারে সেতুর পূর্ব প্রান্ত ছুঁয়ে রয়েছে। সেতুটি পার হ'লেই আপনি শহরের পশ্চিম ফটকে গিয়ে হাজির হবেন। অন্য কোনো রাস্তা নেই। লুটিং শহর পাহারা দেওয়ার জন্য শত্রুপক্ষের দুটো রেজিমেণ্ট রয়েছে—তারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ রচনা করেছে। সেতুর গা ঘেঁষে মেশিন-গান বসানো হয়েছে এবং সেগুলো থেকে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে অবিরাম গুলিগোলা ও মর্টার বর্ষণ করেই চলেছিলো।

তাদের অবস্থান দুর্ভেদ্য এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলো বলেই শত্রুরা আমাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিলো—এবং গলা ছেড়ে আমাদের বলছিলো : "উড়ে চলে এসো বাছারা ! তাহলে নির্ঘাৎ আমরা অস্ত্রসমর্পণ করবো !"

আমাদের সৈন্যরা পাল্টা জবাব দিলেন : "তোমাদের অস্ত্রের আমাদের কোনো দরকার নেই। তোমাদের ঐ সেতুটাই আমাদের চাই !"

আমরা এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে ভার দিলাম রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে শত্রুপক্ষের নূতন শক্তি সঞ্চয়ের পরিকল্পনাকে—দক্ষিণ দিক থেকে সেতুর পূর্ব-প্রান্তে, নূতন কোনো সৈন্য দলের এসে পৌছানোকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য। এদিকে আমাদের এপারেও পাহাড় থেকে নদীর পার পর্যন্ত একটি মাত্র সংকীর্ণ রাস্তা ছিলো যা দিয়ে শত্রুরা আসতে পারতো। তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে আমরা সৈন্যদের মধ্যে জমায়েতের ব্যবস্থা করার কাজে লেগে গেলাম। সবার মধ্যেই তখন প্রচুর উৎসাহ। প্রতিটি কোম্পানী থেকেই নামের তালিকা দেওয়া হলো যারা প্রথম আঘাত হানার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উদগ্রীব। প্রত্যেক গ্রুপেরই দাবী হলো যেন তাদেরই সেতুটি প্রথমে দখল করার ভার দেওয়া হয়।

দুপুরে আমরা রেজিমেণ্টের অফিসারদের একটা মিটিং ডাকলাম—কোন্ দলকে আঘাত হানার ভার দেওয়া হবে তা স্থির করার জন্য। আমাদের আলোচনা শুরু করতে না করতেই যে ঘরে আমরা সভা করছিলাম—তার ছাদে শত্রুপক্ষের একটি মর্টার এসে পড়লো এবং ছাদটিতে বিরাট একটা গর্ত হয়ে গেলো। গোলার টুকরো এবং ভাঙা টালির টুকরো ঝুরঝুর করে আমাদের ওপর পড়লো। আমরা কেউ জায়গা থেকে নড়লাম না,—শুধু আমরা প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্ব তীরের দিকে তাকালাম।

আমি বললাম: "শত্রুরা আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করছে। দ্রুত আমাদের সেতুটি পার হতে হবে। এখনই ঠিক করে নিতে হবে কোন্ কোম্পানীকে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে পাঠাবো আমরা।

দ্বিতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডার লিয়াও তা-চু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ উনি, কম কথা বলেন; এবার এগিয়ে এসে কথা বললেন, যদিও অনভ্যস্ততার জন্য তাঁর-রোদে-পোড়া কালো মুখ লাল হয়ে উঠেছিলো। তার ছোটোখাটো শক্তসমর্থ শরীরটি উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো: "প্রথম কোম্পানীকে একটা আদর্শ কোম্পানী হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে উকিয়াং নদী পার হওয়ার কৃতিত্বের জন্য। আমরাও তাদের আদর্শ অনুসরণ করে লুটিং সেতু দখল করে বীরদের বাহিনী হিসাবে সম্মানিত হতে চাই।"

তৃতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডার সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তিনি হঠাৎ মাঝখানে বলে উঠলেন মেশিনগানের গুলি ছোড়ার মতো দ্রুততার সঙ্গে: "সেতুটি দখল করার ভার তৃতীয় কোম্পানীকেই আপনাদের দেওয়া উচিত। আমরা তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা সব ক'টি যুদ্ধেই খুব ভালো করে লড়ে এসেছি। সেতু দখল যে আমরা করবোই সে গ্যারান্টি দিচ্ছি।" একটা লোহার থামের মতো তিনি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ভীষণ চিন্তিত মুখে বললেন: "আপনারা যদি তৃতীয় কোম্পানীকে এই দায়িত্ব না দেন, তবে আমি ওদের কাছে গিয়ে আর মুখ দেখাতে পারবো না।"

উত্তেজিত তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেলো, কোনো কোম্পানীই তাদের অগ্রাধিকারের দাবী থেকে সরে যেতে রাজী নন দেখা গেলো। তাই ভার পড়লো নেতৃত্বের ওপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার

ও আমি একটু কথা বলে নিলাম ; তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে দ্বিতীয় কোম্পানীই সেতু দখলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমি তখন দাঁড়িয়ে বললাম :

"আপনারা তো লড়তে চাইছেন, সামনে অনেক লড়াই রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই প্রচুর সুযোগ পাবেন। উকিয়াং নদী পেরোবার সময় প্রথম কোম্পানী সুযোগ পেয়েছিলো ; এবার দ্বিতীয় কোম্পানীকেই আক্রমণ শুরু করার ভার দেওয়া হোক। দ্বিতীয় কোম্পানী থেকে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য তরুণদের বাছাইকরা বাইশজনকে নিয়ে অভিযানকারী দলটি গড়া হবে—কমাণ্ডার লিয়াও তাদের নেতৃত্বে থাকবেন। আমার তো মনে হচ্ছে এটা একটা ভালো ব্যবস্থাই হলো। আপনারা সবাই কী ভাবছেন ?"

উৎসাহ সহকারে উপস্থিত সকলেই সহর্ষে সম্মতি জানালেন। শুধু তৃতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডারই রাগে গজগজ করতে লাগলেন। আমি তাকে শান্ত করে বললাম : "তৃতীয় কোম্পানীর কাজও কিছু সহজ নয়। আপনাদের একেবারে দ্বিতীয় কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে এবং শিকলের ওপর কাঠ ফেলে ফেলে রাস্তা করে দিতে হবে যাতে আমাদের বাকী লোকেরা শহর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যেতে পারেন।" দেখলাম কথাটা শুনে তৃতীয় কোম্পানীর কমাণ্ডারের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

সবশেষে-কোম্পানী কমাণ্ডারদের নির্দেশ দিলাম স্থানীয় জমিদারদের বাড়ী থেকে যে নুন-মাখানো মাংস পাওয়া গেছে তার থেকে সবাইকে এক কেটি অর্থাৎ ৫০০ গ্রাম করে দিয়ে দেওয়ার জন্য। পেটভরা থাকলে সৈন্যরা লড়েন ভালো ! সভার পর রেজিমেণ্টের পার্টি সম্পাদককে বললাম দ্বিতীয় কোম্পানীর দলটিকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করার জন্য।

বিকাল চারটায় আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার ও আমি সেতুর পশ্চিম পারে থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগলাম। রেজিমেণ্টের সমস্ত বিউগলবাদকরা একযোগে অভিযানের আহ্বান জানিয়ে দিলেন—এবং আমাদের যতো অস্ত্রশস্ত্র ছিলো সব কিছু নিয়ে অপরপারের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে শুরু করলাম। গুলির শব্দ, লোকজনের চীৎকার সারা তল্লাটকে কাঁপিয়ে তুললো। টমি গান ও বড়ো ছোরা পিঠে বেঁধে নিয়ে, বেল্টে বারোটি করে হাতবোমা গুঁজে নিয়ে কমাণ্ডার লিয়াও এর

নেতৃত্বে বাইশজন বীর সেতুর ঝুলন্ত শিকলগুলো বেয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণকে পরোয়া না করে। তাদের পেছনে পেছনে এগিয়ে যেতে লাগলেন তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা পূর্ণ যুদ্ধসজ্জার সঙ্গে এক একখানি করে তক্তা সঙ্গে নিয়ে। যুদ্ধ করতে করতেই তারা তক্তা বিছিয়ে চলেছিলেন।

আমাদের আক্রমণকারী দলটি যখন প্রায় অপর পারে পৌঁছে গেছে এমন সময়ে লুটিং শহরের পশ্চিম ফটকের কাছে আকাশ কালো করে বিরাট ধুঁয়োর কুণ্ডলী ও আগুনের হলকা আকাশে উঠছে দেখা গেলো। বোঝা গেলো শত্রুরা আগুন জ্বালিয়ে আমাদের গতিরোধ করতে চাইছে—এবং আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছে। আগুনের লকলকে লাল শিখাগুলো ভীষণ ভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সেতুর পূর্বপ্রান্ত ঘিরে।

আমাদের গোটা আক্রমণের পরিকল্পনাটাই বানচাল হওয়ার জোগাড় হলো। শহরের ফটকের পাশে আগুনের হলকা দেখে আমাদের অভিযাত্রী দলটি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। আমার ও রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের কাছে যারা দাঁড়িয়েছিলেন সবাই চীৎকার করে বলে উঠলেন: "এগিয়ে যান কমরেডরা! আক্রমণ করুন ওদের। আপনাদের ওপরই বিজয় নির্ভর করছে! আগুন দেখে ভয় পাবেন না—জোরে আক্রমণ করে এগিয়ে চলুন! শত্রুরা ভেঙ্গে পড়ছে।"

আমাদের চীৎকার শুনে উৎসাহিত হয়ে বাইশজন বীর কমরেড আগুনের হলকার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পডলেন। আমরা দেখতে পেলাম কোম্পানী কমাণ্ডার লিয়াও এর টুপিতে আগুন ধরে গেছে। তিনি তা ছুড়ে ফেলে লড়াই চালাতে লাগলেন। সৈন্যদের মাথার চুল ও ভুরু আগুনে পুড়ে যেতে লাগলো কিন্তু সেই কুণ্ডলী পাঁকানো ধোয়া ও আগুনের হলকার মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে চললেন শহরের দিকে। কমাণ্ডার লিয়াও-এর পেছনে পেছনে তারা প্রাণপণে এগুতে লাগলো। সেতু পার হয়ে শহরের পথে পা দিতেই শত্রুরা সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো আমাদের অভিযাত্রী দলটিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। এই বাইশজন বীর তাদের সর্বশেষ গুলি ও বোমা ব্যবহার করেও লড়ে যেতে লাগলেন। অবস্থা ভীষণ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের অভিযাত্রী দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ার চরম বিপদের মুখে তখন।

ঠিক এমন একটা মুহূর্তেই তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা ওদের সাহায্যের জন্য সেখানে পৌঁছে গেলেন। তারপর রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার ওয়াং ও আমি ছুটে ওখানে চলে গেলাম সেতু পার হয়ে আমাদের দ্বিতীয় বাহিনীকে নিয়ে এবং শহরে ঢুকে পড়লাম।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুপক্ষের দুটো রেজিমেণ্টের অর্ধেকের মতো লোককে আমরা শেষ করে দিতে পারলাম। বাকীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো। সন্ধ্যার মধ্যেই গোটা শহরটি আমরা দখল করে নিলাম, সেতুটা পুরোপুরি আমাদের দখলে চলে এসেছে তখন।

আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো শত্রুপক্ষের যে কোনো প্রতি-আক্রমণকে পরাজিত করা এবং যে কোনো মূল্যে সেতুটি আমাদের দখলে রাখা। আমরা জানতাম তাচিয়েলুর কাছাকাছি শত্রুদের ক'টি রেজিমেণ্ট রয়েছে—তাই একটা ব্যাটালিয়নকে ঐ দিকে প্রহরা দেওয়ার জন্য পাঠালাম। অন্য একটি ব্যাটালিয়নকে পাঠানো হলো দক্ষিণ থেকে নদীর পূর্বতীর ধরে যে দুটো শত্রুপক্ষের ব্রিগেড আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গতকাল থেকে দ্রুত সেতুর দিকে আসছে তাদের আটকে রাখার জন্য। রাত দশটা নাগাদ আমরা শুনতে পেলাম আমাদের একটি অগ্রসর ব্যাটালিয়ন গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। শত্রুদের সঙ্গে ওদের মোকাবেলা হয়েছে ধরে নিয়ে আমরা জোর লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আমাদের ব্যাটালিয়ন অবস্থান গ্রহণ করে নিলো—একটি অভিযাত্রী দল পাঠানো হলো ব্যাপারটার খোঁজ নেওয়ার জন্য। ওরা একজন আহত সৈনিককে ধরে নিয়ে এলো। দেখা গেলো আহত সৈনিকটি আমাদেরই প্রথম লাল ডিভিশনের তৃতীয় রেজিমেণ্টের একজন কমরেড। আমরা বুঝতে পারলাম প্রথম ডিভিশন এসে পৌঁছে গেছে। আমরা সবাই তৈরী হচ্ছিলাম ভীষণ একটা হিংস্র লড়াই-এর জন্য—এখন সব কিছু জেনে সকলেই খুব শান্তি পেলো আর চারদিকে আনন্দের প্রচণ্ড কলরব শুরু হয়ে গেলো।

প্রথম লাল ডিভিশনের সঙ্গে শত্রু সৈন্যদের দেখা হয় লুটিং সেতু থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণে একটা জায়গায়। উত্তর ও দক্ষিন এই দু'দিক থেকে আক্রমণের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয়ে শত্রুপক্ষের ব্রিগেড দু'টি ভয় পেয়ে হুয়ালিংপিঙ-এর দিকে পালিয়ে গেছে।

আমরা তখনই আর্মি চীফ-অফ-স্টাফ লিউ পো-চেঙ এবং জেনারেল নিয়ে জুং-চেন-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তাঁদের শহরে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালাম। আমাদের সকলের পক্ষেই তা' ছিলো খুবই মধুর একটা পুনর্মিলন উৎসব।

ওঁরা যখন এসে পৌছলেন তখন প্রায় রাত দুটো। তা সত্বেও ওঁরা আমাদের ব্রিগেডের সৈন্যদের পরিদর্শন করতে জেদ ধরলেন। একটা লণ্ঠন নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চললাম। জেনারেল লিউ সব খুঁটিয়ে দেখছিলেন যেন পুরো ব্রিগেডটিকে তিনি মনে গিঁথে নিতে চাইছেন। ফিরে আসার সময় মাঝ পথে থেমে তাতু নদীর প্রমত্ত জলরাশির দিকে তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কাঠের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে ফিস ফিস করে তিনি বলতে লাগলেন: "লুটিং সেতু, তোমাকে পাবার জন্য প্রচুর রক্ত দিয়েছি আমরা, কিন্তু তোমাকে জয় করে তবে ছেড়েছি আমরা!"

শত্রুদের কাছ থেকে ধৃত দলিলের মধ্যে চিয়াং-এর জেনারেল লিউ উয়েন-হুই-এর একটি জরুরী বার্তা পাওয়া গেলো। তাতে লেখা রয়েছে: "চুতে আর মাও সে-তুঙ দ্বিতীয় শী তা-কাই হতে যাচ্ছে! তাদের সামনে তাতু আর পেছনে রয়েছে সোনালি বালির নদী। তারা বোতলে বন্ধ মাছের মতো আটকে পড়েছে। এই হচ্ছে লাল দস্যুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার সবচেয়ে চমৎকার সময়।"

আমাদের সৈন্য বাহিনীর নেতাদের বন্দী করতে পারলে লি উয়েন-হুই পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছিলো। আমাদের আর্মি চীফ-অফ-স্টাফ পরিহাস করে বললেন: "শত্রু আমাদের বেশ কদর দিয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন, আমার মাথার দাম ধরেছে তারা এক লক্ষ রূপোর ডলার!"

আমাদের সৈন্যদের তখন কী হাসি: "আমরা শী তা-কাই এর অনুসৃত পথ ধরেই এগিয়ে এসেছি—কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কমিউনিস্ট পার্টি ও চেয়ারম্যান মাওএর পরিচালিত গণফৌজ বলেই জয় আমাদের সম্ভবপর হয়েছে।"

পরের দিন জেনারেল লিন পিয়াও আমাদের মূল বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌছলেন। তাঁর উষ্ণ অভিনন্দন আমাদের বিপুল উৎসাহ জোগালো।

তারপর এলেন চেয়ারম্যান মাও, প্রধান সেনাপতি চুতে, ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ এন-লাই ও অন্যান্য বাহিনী ও সংগঠনের নেতারা। হাজার হাজার সৈন্য সারিবদ্ধভাবে লুটিং সেতু দিযে পার হয়ে গেলেন। তাতু নদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আমরা অতিক্রম করে ফেললাম।

যে বাইশ জন বীর প্রথম সেতু অতিক্রম করেছিলেন সামরিক কমিটি তাদের বিরাট প্রশংসা করলেন। তাঁদের দুঃসাহসী অভিযান আমাদের সামরিক বাহিনীর ইতিবৃত্তে গৌববময় একটি অধ্যায সংযোজন করেছে।

বরফের পাহাড় পেরিয়ে

কর্ণেল চিয়াং কুয়ো-হুয়া

১৯৩৫ এর গ্রীষ্মকালে ফার্স্ট ফ্রন্ট রেড আর্মি সেচুয়ান সিকাং সীমান্তে অবস্থিত তিয়েনচুয়ান এবং লুসান জেলা দু'টি দখল করে নেয়। তিয়েন-চুয়ানে দিন তিনেক বিশ্রাম নেওয়ার পর, খাদ্য ও শীতের পোষাক আষাক যথাসম্ভব জোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে তারপরই আমাদের পথে অবস্থিত বরফাচ্ছাদিত বিরাট পর্বতমালার অংশ চিয়াচিন পর্বত অতিক্রম করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

লালফৌজের তৃতীয় বাহিনীর সরবরাহ বিভাগের প্রধান চৌয়ু-চেং এর আর্দালি আমি ঐ সময়ে। তাতু নদী পেরোবার সময়ই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, আমার অসুখ তখনও সারেনি। তিয়েনচুয়ানে যখন পৌছলাম শরীরটা তখন বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে। জ্বর হতো, মাথা ঘুরতো, বমি হতো, পেটের অসুখও ছিলো। ক'দিন ধরে এক টুকরো কিছু মুখে দিতে পারি নি। কিন্তু যখন দেখলাম বার্তাবাহকরা খুব ছোটাছুটি করছেন, বুঝলাম যাত্রা শুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। দাঁতে দাঁত চেপে আমার কাজকর্ম করে যাচ্ছিলাম।

সেনাবাহিনীর নানা দলকে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার বিজ্ঞপ্তি পৌছিয়ে দিয়ে এসে একদিন বিকালে টের পেলাম আমার কখনো শীত করছে আর কখনো আবার বেশ গরম লাগছে। মাথাটা বেশ ভারী লাগছিলো, সহ্য করতে না পেরে যে তক্তার ওপর ঘুমাতাম তাতে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে টের পেলাম কার একখানি উষ্ণ হাত আমার কপালে এবং তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন: "চিয়াং কুয়ো-হুয়া, চিয়াং কুয়ো-হুয়া..." তাকিয়ে দেখলাম সরবরাহ বিভাগের প্রধান আমার কপালে হাত রেখে পাশেই বসে রয়েছেন, হাতে তার খাবারের পাত্র এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ধীর কণ্ঠে আমার দিকে একটু ঝুঁকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন:

"এটা খেযে নাও, ভুট্টোর ছাতু দিযে কমরেডরা তোমার জন্য তৈরী করে দিযেছেন।"

আমি এমন অভিভূত হযে পড়লাম যে আমার কান্না পেযে গেলো। উঠে বসাব চেষ্টা কবলাম সমস্ত শক্তি দিযে এবং খাবারের পাত্রটা সরিযে দিযে বললাম: "আমি খাবো না, আমি খেতে চাইনা। আপনি সরববাহ বিভাগেব প্রধান, আমি আপনাব আর্দালি, কিন্তু আমি তো আমার কোনো কাজই কবতে পারি নি, খাবো কেন?"

আমাব প্রধান একটু হাসলেন, বললেন, "এভাবে কথা বলছো কেনো? তুমি যখন সুস্থ ছিলে তখন তো তুমি তোমাব যথাসাধ্য কবেছো আমার জন্য। এখন তুমি অসুস্থ, তোমার যত্ন নেওযাই তো আমার কর্তব্য। না খেলে তো চলবে না। আমাদের তো এগিযে চলতেই হবে, চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওযার জন্য আমাদের চিযাচিন,পর্বত পার হতে হবে যে।"

কৃতজ্ঞতায তখন মন আমার ভবে উঠেছে, চোখে জল জমছে। তাঁর হাত থেকে খাবাবের বাটিটি নিযে মণ্ডটি খেযে নিলাম। বেশ শান্তি পেলাম এবং আরাম বোধ কবলাম। মনেও বেশ জোব পেলাম। প্রধান আমাকে নানা সান্ত্বনা দিযে আমাকে ঘুম পাড়িযে ধীরে ধীবে চলে গেলেন।

ছটফট করে তন্দ্রায জাগরণে বাত কাটাতে কাটাতে শুনলাম আমার প্রধান আর চীফ এ্যাকাউন্টেণ্ট আলাপ কবছেন অসুস্থ কমবেডদের সঙ্গে নিযে যাওযা সম্ভব হবে কিনা আর তা সম্ভব না হলে ওদেব জন্য কী ব্যবস্থা কবা যায সেই বিষয নিযে। আমার কথাও উঠলো। আমাব বুকটা যেন হিম হযে যাচ্ছিলো—আমাব অবস্থাব কথা ভেবে। আমার অতীতের কথা সব মনে পড়তে লাগলো। পনর বছর বযসে লালফৌজে যোগ দিযেছি আর পার্টিব রক্ষণাবেক্ষণেই বডো হযে উঠেছি। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওযার দিন থেকেই পার্টি আমাদেব শিক্ষা দিযে আসছে যে পৃথিবীতে এমন কোনো অসুবিধাই নেই একজন কমিউনিস্ট যা জয করে নিতে পারেন না। আর আমি কিনা আজ একটা তুচ্ছ অসুখের কাছে কাবু হযে যাচ্ছি? কোনো মতেই তা হতে দেবো না। আমি পেছনে থেকে যাবো না। যতক্ষণ প্রাণ আছে লালফৌজের সঙ্গেই থাকবো।

সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না, বার বার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

পরদিন খুব ভোরে সৈন্যরা রওয়ানা হওয়ার আগেই সরবরাহ বিভাগের প্রধান আমার কাছে এলেন। দরদভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি ভালো আছি কিনা। আমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম: "কমরেড প্রধান, আপনারা আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি ফৌজের সঙ্গেই যেতে চাই।"

তিনি বোঝানোর সুরে বলতে লাগলেন: "দেখো, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠোনি এখনও। ফৌজের সঙ্গে চলা তোমার পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। তুমি বরং এখানে ক'দিন থেকে বিশ্রাম নাও। শরীর সুস্থ হওয়ার পর তুমি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতে পারবে।"

আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। একথা শুনে তাঁর জামা আকড়ে ধরলাম, বললাম—"আমি পার্টিকে ছেড়ে থাকতে পারবো না, ফৌজকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ফৌজের সঙ্গেই যাবো। মরতেই যদি হয়, আমি ফৌজের সঙ্গে থেকেই মরতে চাই!"

আমি যে কতোখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তা' বুঝতে পেরে সরবরাহ বিভাগের প্রধান আর কোনো আপত্তি করলেন না। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহভরে বললেন: "ঠিক আছে, তোমার অনুরোধ রাখছি। তুমি ফৌজের সঙ্গেই যাবে। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে আমার খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দাও। তোমার রাইফেলটি আমাকে দিয়ে দাও, আমি তা বয়ে নিয়ে যাবো।"

রওয়ানা হয়ে পড়লাম। একটা লাঠি নিয়ে সেনাদলের সঙ্গেই হাঁটতে শুরু করলাম। তিন দিন পর আমরা চিয়াচিন পর্বতের পাদদেশে এসে পৌছলাম।

পরদিন খুব ভোরেই বিউগল বেজে উঠলো। সেনাদল পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করলো। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে লোকজনেরা বরফের মধ্য দিয়ে ছাগল-চলার-সরু-পথ-ধরে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাদেই সূর্য উঠলো। নীচ থেকে পর্বতের চূড়া রোদে ঝিকঝিক করছে দেখতে পেলাম। আর দেখলাম আকাশের দিকে এঁকে বেঁকে আমাদের সৈন্যদল

একটা বিরাট দীর্ঘদেহী ড্রাগনের মতো এগিয়ে চলেছে। আমরা যখন রওয়ানা দিই তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, রাস্তা তখনও অনেকটা সমতল, আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। কিন্তু যতো সময় কাটতে লাগলো আমার অবস্থা ততোই সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে আমার পেট নামলো, খানিকটা জিরিয়ে নিতে হলো। ক্রমেই আমি পেছনে পড়ে যেতে লাগলাম। দাঁতে দাঁত চেপে আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললাম। বিরাট একটা পাইন গাছের কাছে এসে বুঝলাম আমার মাথা ঘুরছে—আর এক ইঞ্চিও এগোনোর শক্তি ছিলো না। বসে পড়লাম। আমাদের দলের তরুণ ভারবাহী লি চিউ-লেঙ তার কাঁধের দুটো ঝোলানো বোঝা নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার দু'জনে সব সময় ঠাট্টা তামাসা করতাম। আমার দশা দেখে সে বললো: "চিয়াং কুয়ো-হুয়া, কেমন লাগছে এখন? আসো না, বাক্সী রেখে চলা যাক! চলো! পাহাড়টা পার হলেই তো চতুর্থ বাহিনীর কমরেডদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাবে।"

আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। কে এগিয়ে চলতে চায় না বলুন তো? কিন্তু আমার পা যে চলছে না। পা দুটো একটু নড়াতেই পারছি না। নিজেকে ভরসা দিয়ে বললাম: "চলো না, বসে কী হবে? আমাদের ইউনিটের প্রায় সবাই তো এগিয়ে গেছেন।"

লাঠিতে ভর দিয়ে প্রাণপণে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু তক্ষণি ধপাস করে বসে পড়লাম। তাকিয়ে দেখলাম আমি অল্প পথই এগোতে পেরেছি এই খাড়া পথের। হায়রে, এই কি হাল হবে আমার? আমি তখন উভয়-সংকটে পড়েছি। আমাদের বাহিনীর অশ্বরক্ষী বৃদ্ধ ওয়াং তার খচ্চরটি নিয়ে আমার সামনে এলেন। চেয়েই চিনলাম এটা আমার প্রধানেরই খচ্চর।

বৃদ্ধ ওয়াং বললেন: "খচ্চরের পিঠে উঠে পড়ো! এখানকার রাস্তা তো বেশ সমানই দেখা যাচ্ছে।"

আমি দ্বিধাগ্রস্ত তখন, কোনো জবাব দিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি খচ্চরের পিঠে চেপে বসার জন্য ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিলো। কিন্তু আমি চড়তে যাবো কোন আক্কেলে? আমার সঙ্গে তো কিছুই নেই। সরবরাহ বিভাগের প্রধান আমার রাইফেলটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—তিনি নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কথা ছিলো আমি তাঁর যত্ন নেবো, এখন উল্টো তিনিই আমার

যত্ন নিচ্ছেন! খচ্চরটির দিকে তাকালাম, তারপর বৃদ্ধ ওয়াং এর দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে, একটি কথাও বলতে পারছিলাম না।

বৃদ্ধ ওয়াং আমার মনোগত ইচ্ছাটি আঁচ করতে পেরেছেন মনে হলো। তিনি পীড়াপীড়ি করলেন: "শোনো বাছা, সরবরাহ বিভাগের প্রধানের আদেশেই আমি খচ্চরটিকে নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি চেপে বসো তো। পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর তোমার ভালোই লাগবে মনে হয়। চতুর্থ সেনাবাহিনী ওপারে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। সেখানে নিশ্চয়ই একটা হাসপাতাল রয়েছে।"

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বৃদ্ধ ওয়াং আমাকে সাহায্য করে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিলেন এবং আমরা পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম।

যতো উপরে উঠছি রাস্তা ততোই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আর খাড়াই বাড়ছে। বাতাস হালকা হয়ে উঠছে। খচ্চরে চড়া এমন একটা পথে রীতিমতো বিপজ্জনক। আমি নেমে পড়লাম এবং খচ্চরটির লেজ ধরে ধরে এগোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। পথটা এগিয়ে চলেছে নিস্তব্ধ বরফাচ্ছাদিত বৃক্ষশূন্য এলাকার মধ্য দিয়ে। আরো কিছু কমরেডও আমার মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারাও দাঁতে দাঁত চেপে পাহাড় বেয়ে উঠছিলেন। সামনের কমরেডদের পেছনে পেছনে। বেলা এগারোটা নাগাদ পর্বতশিখরের দু' মাইলের মধ্যে এসে পড়লাম। বিউগল বাজিয়ে সবাইকে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে বলা হলো। অনেকে ছুটে গিয়ে জলের ডোবা থেকে জল খেতে লাগলেন—অন্যরা তাদের খাবার বের করে খেতে বসলেন। খেয়ে দেয়ে পাহাড় পেরোবার শেষ চেষ্টা করা হবে।

পাহাড়ের এই অংশটুকু যদিও খুব দীর্ঘ নয় কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছিলো। আমার শরীরটা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে—অনেকক্ষণ হয় কিছুই খাই নি। হঠাৎ বাতাস ভীষণ রকম হালকা হয়ে পড়লো। পর্বতশিখর তখনো প্রায় দু'শো গজ দূরে। শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। মাথা ঘুরছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে—এগোনোর তো কথাই উঠে না আমি দাঁড়াতেই পারছিলাম না। নিজেকে বললাম: "এবার সব শেষ হয়ে গেছে।" কিন্তু তখনই ভাবলাম: "পর্বতের চূড়ার

কাছে এসে এভাবে হেরে যাবো ? এখন দমে গেলে, পড়ে গেলে চলবে না—তাহলে কিন্তু সবই শেষ হয়ে যাবে।"

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। এভাবে যখন মরণপণ চেষ্টা করছি ভাগ্যক্রমে সিগন্যাল বাহিনীর কমরেডরা এসে আমাকে সাহায্য করলেন। ঠিক এমন সময়ে পেছনে একটা শব্দ ও চীৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের একজন ভারবাহী কমরেড পা পিছলে তার বোঝা সহ পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়ে গেছেন। বুঝতে পারলাম আমাদের তরুণ কমরেড লি চিউ-শেং ছাড়া এই কমরেড আর কেউ নন। এই তো খানিক আগে সে আমাকে হাসি পরিহাস করে প্রতিযোগিতায় নামতে বলেছিলো ! আশে পাশে সকল কমরেডের চোখ জলে ভরে উঠলো। আমার বুকটা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। আরেকজন ঘনিষ্ঠ কমরেডকে হারালাম আমরা।

কী ঘটেছে জানতে পেরে সরবরাহ বিভাগের প্রধান তাড়াতাড়ি করে সেখানে এলেন এবং জলভরা চোখে লি চিউ-শেংএর দেহটিকে কবর দিলেন। লি চিউ-শেং এর কাঁধে যে দুটো বোঝা ছিলো সেই দুটো নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি আমার কাছে এলেন এবং এক হাতে আমাকে ধরে আমার সঙ্গেই হাঁটতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস শুরু হলো। কালো মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে গেলো। চারদিক অন্ধকার হযে উঠলো। শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। ঝড় বাড়তে লাগলো আর আলুর মতো বড়ো বড়ো শিলা তখন আমাদের ওপর পড়তে লাগলো। লোকজনেরা থালা দিয়ে মাথা ঢেকে নিলেন বা মাথায় কম্বল চাপিয়ে দিলেন। আমি দুখানি ভেড়ার চামড়ার একখানি আমার প্রধানকে দিলাম আর অন্যখানি দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিলাম।

খানিকক্ষণ পরে ঝড় থামলো। সারা পথে এক মানুষ সমান উঁচু বরফের স্তূপ জমে গেলো—তার মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছিলো। পথের দুধারে অনেক কমরেড চিরদিনের মতো পড়ে রইলেন। মাতৃভূমির জনগণের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়াই করে গেছেন। বরফ-ঢাকা সেই পাহাড়ে চিরকালের মতো তাঁরা ঘুমিয়ে রইলেন। "মাতৃভূমির বীর সন্তানেরা চিরকাল অমর হয়েই থাকবেন।"

আমার বিভাগীয় প্রধান কাঁধে সেই বোঝা নিয়ে এক হাতে আমাকে ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন চূড়ায় ওঠার শেষ পথটুকু ধরে।

আমায় বলছিলেন: "বুঝলে হে, বিপ্লব করা সহজকর্ম নয়। পথের পাশে এই যে সব কমরেড চিরনিদ্রায় শুয়ে রয়েছেন তাঁরাও কি বিপ্লবেরই বীর নন?"

দেখতে পাচ্ছিলাম কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠছিলো। আমার হাতেও তাঁর কয়েক ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল পড়লো।

তিনি বলে চললেন: "আমরা তো এখনো বেঁচে আছি। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না। শহীদদের দায়িত্ব আমাদেরই বহন করে নিয়ে যেতে হবে, সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে।"

তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিলো। যদিও বেশ ক'দিন খাইনি, অসুখে বিসুখে জর্জরিত—তবু তো আমি একজন কমিউনিস্ট! বয়স আমার অল্প। যতক্ষণ এক বিন্দু প্রাণ আছে, পাহাড় পার হওয়ার চেষ্টা আমাকে করে যেতেই হবে। দাঁতে দাঁত চেপে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেই গেলাম।

সরবরাহ বিভাগের প্রধান এবার প্রাণ ভরে হেসে উঠলেন। "হাঃ! হাঃ! চিয়াচিন পাহাড় যতোই উঁচু হোক, আমাদের বীরদের দৃঢ়তার কাছে হার তাকে মানতেই হবে। তাহলে, চিয়াং কুয়ো-হুয়া, জিতে গেলে তো! তুমি চূড়া পর্যন্ত উঠে এলে তো!"

নিশ্চয়ই চূড়া পর্যন্ত আসতে পারায় আমার ভীষণ আনন্দ হলো। কিন্তু দম প্রায় ফুরিয়ে আসছিলো। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ! পাথর দিয়ে তৈরী টেবিল সমান উঁচু একটা জায়গা মতো দেখা যাচ্ছিলো—ভাবলাম ওখানে একটু বিশ্রাম নেবো। আমি প্রায় বসতে যাচ্ছি হঠাৎ কে যেন আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলো। আমি হড়কাতে হড়কাতে তিরিশ চল্লিশ পা এগিয়ে গেলাম। যখন থামলাম, ফিরে দেখি আমার প্রধানই আমাকে এভাবে ধাক্কা দিয়েছেন।

হেসে বললেন: "ওখানে বসে জিরিয়ে নিতে পারো। পর্বতের চূড়ায় তোমাকে জিরিয়ে নিতে দেবো না।"

কথা ক'টি বলে তিনি অন্যদের দিকে নজর দিতে লাগলেন।

পর্বতের চূড়ায় এভাবে বসে পড়ার অর্থই ছিলো মৃত্যু। আমি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে জিরোতে লাগলাম। মুখে এক মুঠো বরফ পুরে দিয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। পাহাড় জুড়ে কুয়াশার মতো জমেছে। সূর্যের আলোয় পাহাড়ের চূড়া ঝকমক করছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম, বরফে-ঢাকা উঁচু পাহাড় ক্রমেই পেছনে পড়ে যেতে লাগলো !

লালফৌজের সৈনিকের সেই টুপিটি।

মেজর ওয়াং তে-চিঙ

লালফৌজে আমার যোগ দেওয়ার দ্বিতীয় বছরেই জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হলো। শানসি প্রদেশ রক্ষা করার এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করে সারাদেশের প্রতিরোধের যুদ্ধকে সংহত করার উদ্দেশ্যে একশ বিশ নম্বর ডিভিশনের তিনশ আটান্ন নম্বর ব্রিগেডের সৈনিক হিসাবে আমরা উত্তর শানসির কুয়ো শিয়েন, শিন শিয়েন এবং নিংউর পার্শ্ববর্তী তাইয়ুআন আক্রমণকারী জাপানী শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমাদের সহযোগী সৈন্যদের সাহায্য করার কাজে তখন লিপ্ত।

অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা ওয়েইটস্থনের কাছাকাছি এসে গেছি। শিংকৌ এবং অন্যান্য জেলায় আক্রমণকারী জাপানীদের ঐটিই ছিলো প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। একটি অন্ধকার রাতে পথ হাতড়ে হাতড়ে আমরা একটা গ্রামের দিকে চলেছি দক্ষিণ দিকের একটা সরু রাস্তা ধরে। ঐটিই ছিলো শত্রুদের সঙ্গে আমার প্রথম মোকাবেলার আয়োজন। ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলাম। কিভাবে কী করতে হয় কিছুই ভালো জানিনা তখনো। আমাদের স্কোয়াড লীডার হু তুং-শেঙ আমাকে বলে দিয়েছিলেন তাঁর পেছনে পেছনে চলার জন্য। তিনি ছিলেন পুরনো যোদ্ধা, লং মার্চেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতো।

"রাট—টাট—টাট!" শত্রুর মেশিনগান থেকে কয়েক ঝাঁক গুলি একেবারে আমাদের পাশ দিয়ে উড়ে গেলো। আগুনের ঝলকে আমাদের সামনে একটা দেয়ালের কোণ দেখতে পেলাম। নিজে তার আড়ালে না ঢুকে, স্কোয়াড লীডার আমাকেই সেখানে ঠেলে দিলেন। নিজে দেয়ালের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন আমার পাশেই। শত্রুরা মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি ছুড়েই চলেছিলো আমাদের লক্ষ্য করে। গুলিগুলো প্রায় আমাদের আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো।

স্কোয়াড লীডার শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেই চলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো—যথাসম্ভব ওদের গোলা-গুলি খরচ করিয়ে দেওয়া। ভোর হয়ে এলে শত্রুপক্ষের মেশিনগান শান্ত হলো। হঠাৎ স্কোয়াড লীডার আমাকে বললেন: "ক্ষুদে ওয়াং ভাই! শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হও।" আমাকে এইটুকু বলেই আমার জবাবের জন্য কোনো অপেক্ষা না করেই তিনি লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। আমিও চললাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। শত্রুর মেশিনগানের কাছাকাছি এসে গেছি—এমন সময় শুনতে পেলাম তিনি চীৎকার করে বলছেন: "লাগাও গুলি!" আর সঙ্গে সঙ্গে দু'টো কান-ফাটানো শব্দ হলো। মুহূর্ত মধ্যে দেখলাম সেই ধোঁযার কুণ্ডলীর আড়াল থেকে আমরা শত্রুর একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছি। শত্রুসৈন্যদের একজনকে কাবু করে নিয়ে স্কোয়াড লীডার মেশিনগানটি হস্তগত করে ফেলেছেন। বিরাট করে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেশিনগানটিকে টেনে নিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে। তারপর সৈন্যটিকে কষে জব্বর এমন দু' একটা লাথি দিয়েছেন যে লোকটা যন্ত্রণায় একটা চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। ঠিক এই সময়েই বা-পাশ থেকে কারা গুলি ছুড়েছে আর তা এসে স্কোয়াড লীডারের গায়ে পড়েছে। মেশিনগানটা কিন্তু তখনও তিনি আকড়ে রয়েছেন। ভীষণ ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ছুটে গেলাম তাঁকে তুলে ধরার জন্য আর আমার শরীর দিয়ে তাঁকে আড়ালে রাখার জন্য। কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না (এর মাঝে অবশ্য আমাদের সৈন্যরা সবাই গ্রামে ঢুকে পড়েছে)। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর মাথাটা খানিক তুলে বললেন: "ভাই ওয়াং, ভয় পেয়ো না" তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেলো। তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি একটি পুরনো ছেড়া টুপি পকেট থেকে বের করে আমার হাতে রাখলেন। কিছু একটা বলতে চাইলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কী বলতে চাইলেন তা ভালো শোনা গেলো না। আমি অবশ্য তিনি কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝলাম!

ঐ টুপিটি সম্পর্কে আমাদের কাছে গল্প বলা স্কোয়াড লীডার হু তুং-শেঙ-এর রীতিমতো একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

লং মার্চের সময় ষোল বছর বয়সে নূতন সৈন্য হিসাবে তিনি লালফৌজে যোগ দেন. ঐ সময় একখানি গামছা দিয়ে তিনি নিজের মাথা বেঁধে

রাখতেন। পুরনো কমরেডরা যে চমৎকার আচ্ছাদনী-বিশিষ্ট ও লাল তারা খচিত ফৌজী-টুপি পরে থাকতেন তা পরার তাঁর ভীষণ সখ ছিলো। তাঁর মনে হতো লালফৌজের একজন সৈনিক হিসাবে এ রকম একটা টুপি পরা তাঁর নিতান্ত হক দাবী। টুপিই যদি না থাকলো তবে সে আবার একজন লালফৌজের সৈনিক না কি! এ নিয়ে লং মার্চের সময় রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাকে তিনি সব সময় জ্বালাতন করতেন। বয়সে অনেক বড়ো হলেও আর শরীর প্রায়ই খারাপ থাকলেও রাজনৈতিক শিক্ষাদাতার ব্যবহারটা ছিলো খুবই অমায়িক। এই ক্ষুদে যোদ্ধাটিকে তিনি আপন সন্তান হিসাবেই গণ্য করতেন এবং যখনই ওয়াং তাঁকে টুপির কথা মনে করিয়ে দিতেন—তখনই তিনি হেসে বলতেন এরপরে একটা টুপির ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই তাকে করে দেবেন। আসলে কথা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না কারণ টুপির কথা ছেড়েই দিন—ঐ সময় সাধারণ বাড়তি কাপড়েরই তখন ভীষণ টানাটানি লালফৌজের চলছে!

লালফৌজ তখন অবিরাম মার্চ করে চলেছে। খাবারের অভাব ছিলো, অনেকের শরীর স্বাস্থ্যও ভালো চলছিলো না, কিন্তু অভিযানের আর বিরাম ছিল না। একদিন আরো একটা বরফাচ্ছাদিত পাহাড় অতিক্রম করার সময় হু তুং-শেং টের পেলেন যে তিনি আর একপাও চলতে পারছেন না। দু'দিন তাঁর কিছু খাওয়া হয়নি, ক্ষুধায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছেন। জুতো জোড়া ছিড়ে একাকার হয়ে গেছে, পা দুটো ফুলে উঠেছে। বরফের ওপর বসে সামনের আকাশ-ছোঁয়া পর্বত শিখরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেলো, তিনি তখন উঠে দাড়াতেই পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন তাঁর প্রাণশক্তি শেষ হয়ে আসছে, তাঁর চোখ বেয়ে তখন জল পড়ছে।

এমন সময়ে তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা সেখানে এসে পড়লেন। গত ক'দিনে তিনি অনেক বুড়িয়ে গেছেন, মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে, গাল ভেঙ্গে চোয়ালের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শুকনো মুখ, শরীর একেবারে জীর্ণশীর্ণ। হাঁটার সময় কষ্ট করে পা টেনে টেনে তাঁকে চলতে হচ্ছিলো। এমনিতে তিনি ছিলেন রোগা পাতলা লোক, এখন যে তিনি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন তা একেবারে স্পষ্ট। কিন্তু সব সময়ের

মতোই তিনি শান্ত সৌম্য ছিলেন, এবং ক্লান্তির কোনো কথা তাঁর মুখে শোনা যেতো না। তিনি হু তুং-শেঙ এর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"কি হে, তুমি নাকি! কাঁদছো কেনো?"

"শিক্ষক মশাই, আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে, আমি আর চলতেই পারছি না।"

হু-র পাশে তিনি বসে পড়লেন এবং হু-র পা দুখানি ভালো করে মালিশ করে দিলেন। তারপর তাঁর পকেট হাতড়ে গরুর মাংসের সেদ্ধ করা শেষ টুকরোটি বের করে তা হু-কে দিলেন। হু প্রথমে তা নিতে অস্বীকার করলেন কারণ জানতেন গত দু'দিন রাজনৈতিক এই শিক্ষাদাতার কিছুই খাওয়া হয়নি। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ির পর তা হুকে গ্রহণ করতেই হলো। হুর সারা অন্তর শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

মাংসের টুকরোটি চিবোতে চিবোতে হু মাস্টারমশাই-এর কথা শুনছিলেন। তিনি বলছিলেন এভাবে বসে পড়তে নেই, এভাবে বসে পড়লে আর ওঠার শক্তি থাকে না, শেষ হয়ে যেতে হয়। বিপ্লব তো সহজ কর্ম নয়, আমরা লড়ছি গোটা চীনের জনগণের জন্য তাই প্রাণপণে আমাদের কর্তব্য করে যেতেই হবে।

হু তুং-শেঙ-এর খুব ভালো লাগছিলো, তার দেহেঁও যেন বল ফিরে এলো। রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে চলতে লাগলেন।

পরদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে বিরাট এক তুষার ঝড় উঠলো। হু তুং-শেঙ প্রাণপণে পা টেনে টেনে, কষ্ট করে এক পা এক পা করে এগোচ্ছিলেন সেই বরফের মধ্য দিয়ে। শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিলো। তার শুয়ে পড়ার ও একটু জিরিয়ে নেওয়ার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিলো। কিন্তু শিক্ষক মশায়ের কথা মনে পড়ায় তা করলেন না। দেখতে পেলেন তাঁর সামনেই একজন কমরেড বরফের ওপর অসাড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন। কাছে এসে দেখেন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাই এভাবে পড়ে রয়েছেন। ভীষণ বিচলিত হয়ে হু তুং-শেঙ তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। মাত্র কিছুক্ষণ হয় শিক্ষাদাতা এভাবে ঢলে পড়েছেন। তাঁকে বরফের মতো সাদা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় হয়ে আসছে বোঝা যাচ্ছিলো।

রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা হুকে চিনতে পারলেন এবং জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন: "আমার কথা ভেবো না ; ··এগিয়ে যাও, · অন্যদের পেছনে পড়ে যেও না···"

হু তুং-শেঙ হাঁটু গেড়ে তাঁর পাশে বসলেন নিঃশব্দে। তিনি তাঁর টুপিটি খুলে হুর হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন: "তুং-শেঙ, এই লালফৌজের টুপিটি ···তুমি নাও—"

হুর জুতো জোড়ার জীর্ণদশা লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পায়ের দিকে দেখালেন। তাঁর জুতো জোড়া তখনো বেশ ভালো রয়েছে—অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন: "আমার···জুতো···তুমি পরে নাও ; আমার তো সব শেষ···"

এই শেষ কথাগুলো তুং-শেঙ-এর একেবারে মর্মভেদ করে গেলো। অনেক কষ্টে নিজেকে তিনি সংযত করে রাখলেন, চোখের জল আটকে রাখতে চেষ্টা করলেন। তিনি ঐ টুপি ও জুতো কোনোটাই গ্রহণ করতে পারলেন না। দরকার তাঁর যতোই থাক? কী করে তিনি তাঁর শিক্ষাদাতা, নেতা ও কমরেডের জুতো খুলে নেবেন? জুতো নেবেন না টের পেয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা বললেন: "তা হলে এগোও,·· এগিয়ে···যাও।" ঐ ক'টি কথাই শুধু তিনি বলতে পারলেন। কথাগুলো আদেশের মতো শোনালো। কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছিলো, তারপর একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলো চিরদিনের মতো।

বাতাসে তখন ঝড়ের দমকা, বরফ জমে শক্ত হয়ে উঠছে: আচ্ছন্নতার ঘোর কাটলে হু তুং-শেঙ দেখলেন তাঁর শিক্ষাদাতার দেহ হিমশীতল আর শক্ত হয়ে গেছে। একমাত্র তখনই তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তাঁর শিক্ষাদাতার "এগিয়ে যাও!" এই কথাগুলোর পুরো তাৎপর্য। ঝট করে দাঁড়িয়ে উঠলেন হু, পথের পাশের একটা ঝোপের থেকে কিছু ডালপালা ভেঙ্গে এনে শিক্ষাদাতার মরদেহের ওপর বিছিয়ে দিলেন। তারপর টুপিটি মাথায় পরে নিলেন এবং সযত্নে তাঁর শিক্ষাদাতার পা থেকে কাপড়ের জুতো জোড়া খুলে নিজে পরলেন এবং দৃঢ়পদে সেই মাতাল হাওয়া আর বরফের বাধা ভেঙ্গে এগিয়ে চললেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে—পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে ঝরে-পড়া জলধারার মতো!

জীবনে ঐ প্রথম হু তুং শেঙ পুরোদস্তুর লালফৌজী টুপিটি পরেছিলেন—আর আজ এই মাত্র তা আমার হাতে সমর্পণ করে গেলেন।

*　　　*　　　*

আমার হাতে টুপিটি সমর্পণ করে স্কোয়াড লীডার হু তুং-শেঙ শান্তভাবে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। বেশী কথা বলে যেতে পারেন নি, আমি কিন্তু তাঁর সব কথাই বুঝতে পেরেছি। একাধিকবার টুপিটি আমি দেখেছি এবং তার ইতিহাস শুনেছি। লালফৌজ যখন অষ্টম সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো এবং আমাদের নেতৃত্ব জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংহতির স্বার্থে লালফৌজকে ঐ টুপি পরা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে কুয়োমিনটাং টুপি পরার আহ্বান জানালেন—তখন তাঁর সে কী আফশোষ। তিনি অবশ্য নেতৃত্বের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছিলেন। ওয়েল পেপার দিয়ে টুপিটিকে যত্নে মুড়ে নিয়ে তার বালিশের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হলে ঐটি তাঁর সঙ্গে রাখতেন। মাঝে মাঝে বের করে তা দেখতেন এবং সেই রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা তাঁকে কী বলেছিলেন তা আমাদের শোনাতেন।

তাই আমি জানতাম স্কোয়াড-লীডার কী বলতে চেয়েছিলেন: অবিচল হয়ে বিপ্লবের সঙ্গে থেকো। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না, এগিয়ে যাও। বিপ্লবের জন্যই বেঁচে থাকো আর ঐ প্রবীণ শিক্ষাদাতার মতোই মহান মৃত্যুকে বরণ করে নাও। তাঁর মতোই বিপ্লবের প্রতি অনুগত থেকো। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বলি দিতেও পিছপা হয়ো না।

তাঁর প্রিয় প্রবীণ রাজনৈতিক শিক্ষাদাতার কথাগুলোর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থেকে আমাদের স্কোয়াড-লীডার সব দিক থেকেই নিজেকে একজন যথার্থ বিপ্লবী হিসাবে প্রমাণ করে গেছেন।

জলা-ভূমি জয়ী বীরেরা

জেনারেল ইয়াংচেং-উ

১৯৩৫ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী জনমানবহীন বরফাচ্ছাদিত বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে দুস্তর জলাভূমির প্রান্তে অবস্থিত কাঙমাওস্থতে দিন তিনেক বিশ্রাম গ্রহণ করে। ওখানে পাইন গাছের ছত্রক আর শংকু, গরু ও ভেড়ার চামড়া ভেজে নিয়ে দিন কয়েকের রেশনের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আমরা রওয়ানা দিলাম জলাভূমি পেরোবার দুঃসাহসিক অভিযানে। কাঙমাওস্থ থেকে জলাভূমি পেরিয়ে চালিস্থতে পৌছুতে আমাদের কুড়িদিন লেগেছিলো। আমার বয়স তখন সবে ষোলো। লালফৌজের একটা কোম্পানীতে আমি তখন পতাকাবাহী।

কাঙমাওস্থ থেকে জলাভূমি শুরু হয়েছে—বিশাল এক সমুদ্রের মতো, ধোঁয়াটে, প্রায়ান্ধকার, অন্তহীন। সূর্য দেখা যায় না এমন দিনে দিক-নির্ণয়ের কোনো উপায়ই থাকে না। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র চোরা গর্ত; —শক্ত মাটি থেকে পা হড়কে কেউ একবার তাতে পড়লে দেখতে দেখতে তিনি অতলে তলিয়ে যাবেন—আর নিষ্কৃতির জন্য যতো জোরে চেষ্টা করবেন ততো দ্রুত সেই মৃত্যুগহ্বর তাকে টেনে নিয়ে যাবে। অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলতে হচ্ছিলো আমাদের ঘাসের ওপর দিয়ে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি ছিলো না, ঘাসের চোপড়ায় পা দিলেও মানুষের ভারে তা ডুবে যেতো অনেক সময় এবং কাদা মাখা কালো কুচকুচে বিষাক্ত জলে পা ডুবে যেতো। একজন সরে গেলেই ঘাসগুলো আবার খাড়া হয়ে রাস্তার চিহ্নটিকেও ঢেকে দিতো। চোরাবালির ওপর দিয়ে পথ চলার মতোই তা ছিলো ভয়ংকর এক অভিযান। সৌভাগ্যবশতঃ অগ্রসর একটা ইউনিট মোটা একটা দড়ি ফেলে গিয়েছিলেন সেই ভয়াবহ জলাভূমির মধ্য দিয়ে পথের রেখা হিসাবে। আমরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঐ দড়ির রেখা অনুসরণ করে চলছিলাম। আমরা জানতাম যদি এই দড়িটুকু ছিড়ে যায় তবে আমাদের "প্রাণের ধারা" থেকেই

আমরা ছিন্ন হয়ে পড়বো। ঐ দড়িগাছি আমাদের অগ্রপথিক সেনাদল বহু কমরেডের প্রাণের মূল্যে পথচিহ্ন হিসাবে রেখে গেছেন।

এই দড়ির রেখা ধরে আমরা চারদিন চললাম। পঞ্চম দিনের বিকালে সৈন্যরা একটা শুকনো জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ করে গোটা আবহাওয়াটা একদম বদলে গেলো। উদ্দাম ঝড় উঠলো, কালো মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো। তারপর শুরু হলো শিলাবৃষ্টি, আর প্রচণ্ড তুষারপাত। তুষারপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকজনেরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কম্বল ও লেপ দিয়ে মাথা ঢেকে নিলেন।

তুষারের ঝড় থামলো; লোকজনেরা তাদের মাথার ঢাকনী সরিয়ে ফেললেন এবং একে অন্যে ধরাধরি করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুস্কিল হলো ঝড়ের তোড়ে দড়িপথটি একদম হারিয়ে গেছে। জলাভূমিটা আসলে হচ্ছে বরফাচ্ছাদিত বিরাট সীমাহীন প্রান্তর। আমাদের কোম্পানীর কমরেডরা কমাণ্ডারের নেতৃত্বে এক সারিতে দাঁড়িয়ে হারিয়ে-যাওয়া দড়িটি খুঁজতে লাগলেন। ঘাসের ঢাকনা সরিয়ে দড়িটি খোঁজা হলো—কিন্তু তার কোনো হদিশই পাওয়া গেলো না।

ওখানে ঘাসের ঢিবিতে বেশীক্ষণ বসে থাকা সম্ভব ছিলো না। চারদিকে ভয়ঙ্কর শীত, নিজেদের গরম রাখার মতো জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি কিছুই আমাদের সঙ্গে ছিলো না। অথচ, আমরা যদি এগিয়ে চলি তবে বিপজ্জনক মৃত্যু গহ্বরে গিয়ে পড়ে যেতে পারি। দূর থেকে ওয়েইফেঙ পর্বতের যে আবছা রেখা দেখা যাচ্ছিলো তাকে লক্ষ্য করে কাঙমাওস্থতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিলো না। ওখানে ফিরে অগ্রগামী সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অপেক্ষা করতে হবে।

কাঙমাওস্থতে কয়েকদিন আমরা অপেক্ষা করলাম। অগ্রগামী সৈনিকেরা একজন তাংজে-পথপ্রদর্শক ও আরেকজন হান দোভাষী পাঠালেন। আমরা দ্বিতীয়বারের মতো জলাভূমি পার হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

গতবারের চেষ্টায় আমাদের ক'জন কমরেডকে আমরা হারিয়েছি। পাইনের শংকু আর ছত্রক যা খাদ্য হিসাবে জোগাড় করা হয়েছিলো তা এর মাঝে শেষ হয়ে গেছে। নূতন করে তা জোগাড় করার উপায় ছিলো না কারণ

কাঙমাওস্থ ও তার আশে পাশের অঞ্চল তখন পুরু বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। রওনা হওয়ার আগে ভাজা মুড়ি কড়াই সামান্য যা ছিলো সবাইকে বেটে দিলাম। প্রথম যখন জলাভূমি দিয়ে যাই যেহেতু আমি ছিলাম সবার চেয়ে বয়সে ছোটো তাই কমরেডরা সবাই তাদের রেশন থেকে আমাকে কিছু কিছু ভাগ দিতেন, তা থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম। বরফের জলে ভিজে যারা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন তাদেরকেই খাবারটুকু আগে দেওয়া হলো। দ্বিতীয়বার যখন জলাভূমিতে ঢুকলাম—প্রথম কদিন আমাদের সেই পচা তিতো জলই খেতে হলো। ফলে অনেকেরই পেটের ভীষণ গণ্ডগোল দেখা দিলো—তারা এতো দুর্বল হয়ে পড়লেন যে আর চলতেই পারছিলেন না। যা হোক কিছু না খেলে তো চলবে না তাই এতোদিন যার কথা ভাবিনি সেই জংলী ঘাস এবং ফলমূলের দিকে আমাদের নজর পড়লো। তা খেতে শুরু করলাম আমরা। যখন সবুজের কোনো চিহ্নই ছিলো না এমন সব জায়গায় শুকনো ঘাস জড়ো করে তার মূলই চিবোতে লাগলাম আমরা।

যতো রকমের জংলী গাছগাছড়া আমাদের পথে পড়লো সবই আমরা চিবিয়ে দেখলাম। তারপর আমরা পেলাম কাটাওয়ালা পাতা-ঝরা একরকম গাছ তাতে মটরদানার আকারের লাল ছোটো ছোটো একরকম ফল ধরে রয়েছে যা খেতে অনেকটা অম্লমধুর চেরিফলের মতো। এটাকে বলা যায় আমাদের ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ঐ রকম গাছ দেখলেই আমরা সবাই ছুটে যেতাম নূতন উদ্যম নিয়ে। কিছু কমরেডের খেয়ালই থাকতো না যে তারা মারাত্মক মৃত্যুকূপে-ভরা জলাভূমি দিয়ে চলেছেন—বেশ কিছু কমরেড এভাবে চিরদিনের মতো সেই রাক্ষুসে জলাভূমিতে তলিয়ে গেছেন। অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে গাছে চড়ে পেট ভরে ফল খেয়ে নিয়ে তারপর অসুস্থ ও আহত কমরেডদের জন্য বাকীগুলো সংগ্রহ করে আনতেন।

ষষ্ঠ দিনে একজন কমরেড এক ধরনের জলজ গাছ খুঁজে পেলেন যার গোড়ায় রয়েছে পানিফলের মতো মূল—খেতে বেশ মিষ্টি আর মচ মচে। সকলেই এগুলো খুঁজতে লেগে গেলেন। কিন্তু দেখা গেলো ওগুলো বিষাক্ত। যারা ওগুলো খেয়েছিলেন তারা সকলেই আধ ঘণ্টার মধ্যে বমি করতে লাগলেন। ক'জন তো ওখানেই মারা গেলেন। মৃত্যুকে তো আমাদের

পথ রোধ করতে দেওয়া চলে না। শহীদদের কম্বল খুলে তাঁদের ওপর মেলে দিয়ে আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে পথ চলতে লাগলাম। তাঁদের প্রতি লালফৌজের সৈনিকদের প্রাপ্য আন্তরিক সম্মান দেখিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষাও একটা আমরা পেলাম। তারপর যখনই অচেনা কোনো ফলমূল পেয়েছি, তা ব্যবহারের আগে আমরা খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছি।

একদিন লালঝাণ্ডা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ আমার পায়ের নীচের মাটি বসে যেতে লাগলো, পা সরিয়ে নিয়ে আসারও সময় পেলাম না। আমি তখন তলিয়ে যেতে শুরু করেছি। ভাবলাম: "আমার যা হবার তো হয়েই যাচ্ছে। পতাকাবাহক হিসাবে মৃত্যুকে আমি পরোয়া করি না, কিন্তু লালঝাণ্ডার সম্মান ও গৌরব রক্ষার দায়িত্ব তো আমাকে পালন করতেই হবে—ঝাণ্ডাকে তো আমি মলিন হতে দিতে পারি না।" ধীরে ধীরে ঝাণ্ডার লাঠিটাকে এক হাতে সোজা করে ধরলাম এবং অন্য হাতে কাদার মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগলাম শক্ত মাটি কিছু পাই কি না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে টের পেলাম—যতো জোরে চেষ্টা করছিলাম ততো বেশী বেশী করে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেলাম। ঠিক এরকম সংকটের চরম মুহূর্তে কোম্পানীর কেরানী আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, লাল ঝাণ্ডাটি নিয়ে একটু দূরে পুঁতে রাখলেন এবং তার বাঁশের লাঠি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তা জোরে ধরার জন্য আমাকে বললেন। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি আমাকে টানতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হলো। বরং তিনি যে মাটিতে দাঁড়িয়েছিলেন তাও তলিয়ে যেতে শুরু করলো।

পেছনের সৈন্যরা ঝাণ্ডাটি এভাবে পোতা রয়েছে আর তার পাশেই দুজনে টানাহ্যাচড়া চলছে দেখে বুঝলেন কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। একজন লম্বা মোটা সৈন্য এগিয়ে এলেন। মুহূর্ত মধ্যে তার লেপ খুলে নিয়ে শক্ত একখণ্ড ঘাসের ওপর তা ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে তাঁর রাইফেল দুটো আড়াআড়ি করে রেখে তিনি বাঁশের লাঠিটি ধরে আমার সকল শক্তি দিয়ে তা মরণপণ করে আকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে বললেন। আরো সৈন্যরা এগিয়ে এলেন—আর

রীতিমতো একটা দড়ি টানার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পরে আমি উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। শরীরটাকে নাড়াতে পারছিলাম সহজভাবে। লম্বা মোটা কমরেড আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন—আর তার পর সকলে মিলে জোরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে আমাকে সেই মৃত্যু গহ্বর থেকে বের করে নিয়ে এলেন।

এই প্রথম একজন তলিয়ে-যাওয়া কমরেডকে এভাবে বাঁচানো গেলো। আমার তখন চোখ ফেটে জল আসছে। আমার বয়স খুবই কম তবু যে উৎকণ্ঠা আর যত্ন নিয়ে কমরেডরা চেষ্টা করেছেন তা বুঝতে পারলাম। সেই লম্বা মোটা কমরেডটি ছিলেন আমাদের কোম্পানীরই সৈনিক। ঐ কোম্পানীতে নূতন এসেছি তাই ওর নাম জানতাম না।

"অনেক ধন্যবাদ কমরেড, আপনি····· ?"

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে অন্যান্য সৈনিকদের দেখিয়ে বললেন: "ক্ষুদে তান, ওরা সবাই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার নামে কী হবে ?"

তিনি ছিলেন একজন চমৎকার কমরেড। পরে শুনেছি জলাভূমিতে প্রবেশ করার পর থেকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আমুদে মানুষ, কোম্পানীর সবচেয়ে হাসিখুশি লোক। ক্ষুধা ক্লান্তি কিছুই তাঁকে মজার মজার কথা বলা ও হাস্য পরিহাস থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না। পুরো অভিযানের সময় তিন তিনটা রাইফেল তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন।

ঐ সময় থেকে গোটা লং মার্চে ও যুদ্ধবিগ্রহে সব সময় তাঁর সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়, আমরা দু'জনে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

একদিন বিকালে আমাদের সামনে পড়লো প্রায় দু'শ গজ চওড়া একটা নদী। আশে পাশে নদীর তীরে শুকনো ক'টি পাতাঝরা গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। দিন দুয়েক আগে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে নদীর জল অনেক বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড বেগে নদীর জল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে।

তাংজের পথপ্রদর্শক বন্ধুটি আমাদের একটা গাছের কাছে নিয়ে গেলেন, মোটা একটা তার গাছের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তারের অন্য প্রান্ত নদীর অন্য তীরে নিয়ে আরেকটা গাছের সঙ্গে বাঁধলেন। কমাণ্ডারের নির্দেশে আমরা এক হাতে তার আর অন্য হাতে রাইফেল ধরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা শুরু

করলাম। দশ বারো গজ দূরে গেছি এমন সময় লোকের ভারে ও স্রোতের তোড়ে তার গেলো ছিড়ে। আমি লালঝাণ্ডাসহ জলে ভেসে যেতে লাগলাম ভাটির দিকে। ঝাণ্ডার দণ্ডটি খাড়া করে রেখে জলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। পা রাখার কোনো ঠাঁইই পাচ্ছিলাম না। জল খেতে লাগলাম। সৌভাগ্য-বশতঃ নদীর তীরে কোম্পানী কমাণ্ডার খুব দূরে ছিলেন না—তিনি পার থেকে দেখতে পেলেন এবং ঝাণ্ডাটি লক্ষ্য করে পার দিয়ে ছুটে এসে আমাকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঝাণ্ডাটি ধরে তিনি আমাকে টেনে পারে তুললেন। এই টানা হ্যাঁচড়ায় আমার তখন প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বহুক্ষণ নড়তেই পারছিলাম না।

পরে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লোক পাঠিয়ে তারটি জোড়া দেওয়ালেন। সন্ধ্যার আগেই আমরা ব্যাটালিয়নের সবাই নদী পার হয়ে গেলাম।

তার পরের দিনের বিকালে কচ্ছপের পিঠের মতো বাঁকানো বরফ ঢাকা একটা মাঝারি গোছের পর্বতের সামনে এসে পৌঁছলাম আমরা। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিলো এখানে সেখানে বরফে-ঢাকা ঘর রয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে জোর তর্কবিতর্ক বেঁধে গেলো।

"ঐ দেখোনা, ওগুলো ঘর নয় তো কী? ঘরগুলো থেকে ধোঁয়াও উড়ছে!"

"ধোঁয়া না হাতী! ও হচ্ছে চোখের ধাঁধাঁ!"

বলুন তো জলাভূমির ঐ জনমানবশূন্য রাক্ষুসে এলাকা দিয়ে যাওয়ার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার পর কার না মনুষ্য-বসতি দেখার সাধ হয়? তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রথম জনের কথায় অনেকেরই সায় পাওয়া গেলো। "হতে পারে এই জায়গায় জনবসতি রয়েছে! চলুন না জোরে এগোই!"

অন্ধকার নেমে আসার পর পাহাড়ে পৌঁছা গেলো। সেই স্বপ্নমায়ার ঘর আর ধোঁয়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। যা দেখলাম তা হচ্ছে আসলে বিরাট বিরাট পাইন গাছের একটা ঝোপ। "যাই হোক রাক্ষুসে জলাভূমিকে বিদায় দেওয়া গেছে মনে হচ্ছে!" সকলেরই প্রাণটা যেন জুড়িয়ে এলো।

এখানে ক্যাম্প করা হবে ঠিক হলো। বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা জায়গা মিললো। সবাই একত্র হয়ে লতাপাতা কিছু কুড়িয়ে

এনে একটা আগুন জ্বালানো গেলো। এমন কি তাজ্জব ব্যাপার ঘটালেন আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা—তিনি কিছু পাইনের শংকুও খুঁজে নিয়ে এলেন। তারপর পুঞ্জ পুঞ্জ আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে পাইনের বীজ আর ছত্রকগুলো চিবোতে চিবোতে সকলের শীর্ণদেহ ও শুকনো হলদে হয়ে আসা মুখগুলো আগুনে চকচক করে উঠতে লাগলো। কোম্পানী কমাণ্ডার, কেরানী, বিউগলবাদক আর আমি বসেছিলাম একটা আগুনের চারপাশে। আমাদের ভাঙ্গা মগে করে বরফ জল গরম করে নিচ্ছিলাম। কথা বলতে বলতে ও হাসাহাসি করতে করতে ঐ আগুনের পাশেই আমরা শুয়ে পড়লাম।

ভোরে ঘুম ভাঙলো বৃষ্টির মধ্যে। আগুন নিবে গেছে। গাছের ছোটো ছোটো ডালপালাগুলো ভেঙ্গে আমাদের ওপর পড়তে লাগলো। টিপটিপ করে জলও পড়ছে। অনেক চেষ্টা করে কোম্পানী কমাণ্ডার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের ঠেলতে লাগলেন। একমাঝেই আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছিলাম না। আমার শরীরের তাপে যে বরফ গলে গিয়েছিলো তা আবার জমে আমাকে লেপটে জড়িয়ে ধরেছে। মনে হচ্ছিলো যেন কেউ আমাকে পেরেক দিয়ে আটকে রেখেছে। কোম্পানী কমাণ্ডার আমাকে ধরে টেনে ওঠালেন, আমার গা থেকে বরফের জটগুলো ছাড়ালেন— ; অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর উঠে দাঁড়াতে পারলাম। বিউগলবাদককে নাড়াচাড়া দেওয়া হলো কিন্তু তাঁর কোনো চেতনা আছে মনে হলো না। তাঁর শরীর জমে হিম হয়ে গেছে, হৃদপিণ্ডও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানী কমাণ্ডার ওঁর দেহটাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবলেন হয়তো তাঁর দেহের উত্তাপে ওঁর দেহটায় প্রাণ ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হলো। আমি দেখলাম কোম্পানী কমাণ্ডারের চোখ জলে ভিজে উঠেছে। তারপর তিনি ধীরে ধীরে আগুনের অন্য কুণ্ডলী গুলোর দিকে চলে গেলেন।

কোম্পানী কমাণ্ডার, রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা আর যাঁরা উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলেন তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন সবাইকে জাগিয়ে তুলতে। কিন্তু প্রায় বারোজন কমরেড তখন চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছেন। কুড়িজনেরও কম কমরেডই প্রায় একশ জনের কোম্পানীতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইলাম। মৃত ভাইদের এভাবে ছেড়ে যেতে কোম্পানী কমাণ্ডার ও পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের কষ্টের আর অবধি রইলো না।

পাহাড় থেকে নামলাম। আবহাওয়া ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এলো। সূর্যের তাপে আমাদের শরীরটাতে প্রাণ যেন ফিরে এলো। বরফে-ঢাকা সেই তল্লাটে রোদ লেগে আমাদের জামাকাপড় থেকে তখন ধোঁয়া বের হচ্ছে—ঠিক যেন আমরা উষ্ণ একটা প্রস্রবণ থেকে এইমাত্র বের হয়ে এসেছি!

"ঘর! ঐ দেখো না একটা ঘর দেখা যাচ্ছে!"

"এতো লামাদের একটা মন্দির!"

"মনে হচ্ছে, আমরা জনমানবের বসতির কাছে আবার ফিরে এসেছি!"

দূর থেকে যখন চালির মন্দিরটি দেখা গেলো তখনকার আমার উত্তেজনার বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। রাক্ষুসে জলাভূমি ও বরফের পাহাড় গুলো যে এভাবে পার হয়ে আসা গেছে তাতে সকলেরই সে কী আনন্দ! ক্ষিধের জ্বালায় নাড়িভুড়ি পুড়ে যাচ্ছিলো—এখন খাবারের আশায় তা একেবারে অধীর হয়ে উঠলো।

মন্দির থেকে মাইল খানেক দূরে একটা ছোটো নদী পথে পড়লো। সবাই হৈ হৈ করে জলে নেমে পড়লাম! ভীষণ ঠাণ্ডা জল, কিন্তু ওনিয়ে তখন ভাবার অবসর ছিলো না। দেখতে দেখতে এক নিমেষে আমরা অপর পারে গিয়ে উঠলাম। মন্দির চূড়ার উপরে বাঁধা একটা লাল পতাকা তখন আমাদের সহর্ষ আমন্ত্রণ আর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে!

লংমার্চে লালফৌজের ক্ষুদে সৈনিক

লিয়াও সিং-উয়েন

১৯৩৫ এর শরৎকালে আমি চতুর্থ লাল ফৌজের সঙ্গে তিন তিনটি জনমানবশূন্য তৃণভূমি ও জলাভূমি পার হয়ে এসেছি। মাওয়েরকাই থেকে শাংপাওসো পর্যন্ত শত শত মাইল জুড়ে এই দুস্তর অঞ্চলগুলো অবস্থিত। অন্তহীন সেই তৃণ ও জলাভূমি আমার জীবনে এমন ছাপ রেখে গেছে যে আমি কোনোদিনই তা ভুলবো না। আমার বয়স তখন সবে চৌদ্দ।

১৯৩৫ এর আগস্টের শেষের দিকে আমাদের অভিযান শুরু হয়। সৈন্যদল সেই সমতল তৃণভূমির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ৮৯ নম্বর ডিভিশনের ২৬৭ নম্বর রেজিমেণ্টে "বাচ্চাদের একটা দল" ছিলো। রেজিমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের অধীনে প্রচার দপ্তরের দলের সঙ্গে সদস্য হিসাবে তারা যুক্ত ছিলো। তাদের সকলের বয়সই কুড়ির মধ্যে। প্রায় কুড়ি জনের ঐ দলটির নেতা ছিলেন প্রায় কুড়ি বছর বয়সী একজন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বয়সের। পাঁচ জনকে নিয়ে আমাদের একটি ছোট দল গড়া হলো মার্চ শুরু হওয়ার ঠিক আগটাতে। চাও ক্যাঙ ছিলেন আমাদের নেতা, আমার চেয়ে দুবছরে বড়ো তিনি, আমাদের ছোটো দলের সবচেয়ে বেশী বয়সী। বয়সের তুলনায় একটু বেশী লম্বা, দেখতে তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক বলেই মনে হতো, খুব শান্ত স্বভাবের এবং তিনি আমোদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন। সকলেই আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার সঙ্গে আমাদের সকল ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাইতাম। আমাদের দলে সবচেয়ে ছোট ছিলো হো তেং-নাং, বয়স তার সবে বারো বছর মাত্র। ছোট খাটো দেখতে কিন্তু পেটা শরীর। বাঘের বাচ্চার মতো ছুটতে পারতো—কিন্তু প্রায়ই গড়াগড়ি খেয়ে যেতো। আমি তার নাম দিয়েছিলাম 'ক্ষুদে' গোলক। নামটা ক্রমে আমাদের মধ্যে চালু হয়ে যায়, বেচারা হো অনেকটা দার্শনিকতার সঙ্গেই তা শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলো।

বয়স কম হলে কী হবে, চালচলন আমাদের মোটেই কম বয়সীদের মতো

ছিলো না। আমাদের দলপতি এই অভিযান শুরু হওয়ার বেশ কয়েক দিন আগে ভাগেই প্রত্যেককে যার যার কাজের ভার বুঝিয়ে দিলেন। আমাকে ও আরো দুজনকে নিয়ে তিনি খাদ্যের সন্ধানে চললেন, "ক্ষুদে গোলক"কে প্রহরার কাজে নিযুক্ত করা হলো। শত্রুপক্ষের মিথ্যা প্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্ম্যে এই অঞ্চলের তিব্বতীয়রা সকলেই পালিয়েছেন। পার্বত্য অঞ্চলে যে বার্লি এবং গম উৎপন্ন হয় তা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দিনে খাবার যা সংগ্রহ করা হতো তাতে আমাদের কুলোতো না, ক্ষিধেই মিটতো না। তার উপর বাড়তি খাবার কোথায় পাবো? যাত্রার সময়ে আমাদের হাতে ছিলো কয়েক পাউণ্ড বার্লির পাঁপড় এবং কিছু পরিমাণ গম আমাদের ক্ষুদে দলটির জন্য। মহামূল্য রত্নজ্ঞানে আমরা তা গরুর চামড়ার তৈরী ব্যাগে যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছিলাম।

বিউগল বাজিয়ে যাত্রার আহ্বান জানানো হলো। লাল ফৌজের সৈনিকেরা এগিয়ে চলতে লাগলেন। আমাদের দলপতি সেই মহামূল্যবান ব্যাগটী নিজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন: "দলপতির অনুমতি ছাড়া একটী দানাও কেউ মুখে দিতে পারবে না।"

আমরা বাকীরা কেউ লাকড়ীর বোঝা নিলাম কাঁধে, একজন বয়ে নিয়ে চললো পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী একটা তাঁবু, আমি পিঠে নিলাম একটা ঢাক এবং একটী শিঙ্গা, 'ক্ষুদে গোলক' নিলো এ্যাবড়ো খেবড়ো, ব্যবহারে মলিন একটী হাড়ি—রান্না ও জল গরম করার পক্ষে চমৎকার কাজের এই জিনিসটী। প্রত্যেকের মাথায়ই ছিলো জীর্ণ মলিন বাঁশের তৈরী গোল ছাতা। দূর থেকে আমাদের নিশ্চয়ই কিম্ভুতের মতো দেখাচ্ছিলো রোদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো লাইন দিয়ে পিল পিল করে চলেছি। আমরা যে কাপড় চোপড় পরেছিলাম তার অধিকাংশই জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জিনিস। বহুদিন রোদে পুড়ে ও জলে ভিজে সেগুলোর বদখত চেহারা হয়েছে। আমাদের কিন্তু একটা সুবিধা হয়েছিলো—কোনো সময় অভিনয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হলে সাজ-গোজের জন্য আমাদের ভাবতে হতো না মোটেই। আমার পরণে ছিলো একজন জমিদার নন্দনের আস্তিন-বিহীন কালো একটা জ্যাকেট, আমাদের দলপতির পরণে ছিলো অসম্ভব রকম বেমাপের একটা অঙ্গরাখা, "ক্ষুদে গোলকের" গায়ে ছিলো হলদে ফুল-আঁকা মেয়েদের

একটা ব্লাউজ, এই অদ্ভুত পোষাকের জন্য সবাই তাকে "বৌদি" বলে ডাকতো। লম্বা সারি বেঁধে এগিয়ে চলা অদ্ভুত সাজে সজ্জিত, ছিন্ন কিন্তু বহুবর্ণ পোষাক পরিহিত আমাদের দলটাকে দেখলে মনে হতো ছুটীর দিনে ঘরছাড়া একদল আমুদে লোক যেন এই নিঃস্তব্ধ, জনমানবশূন্য সমভূমিতে রঙের বাহার ছড়াবার জন্য এসে জুটেছে।

জলাভূমিতে প্রবেশ করার দিন থেকে একেবারে খালি, পেটেই আমরা পথ চলেছি একথা বলা চলে। মাত্র কয় পাউণ্ড খাদ্য দিয়ে পাঁচজন লোকের কি করে সাত আট দিন চলে বলুন তো? যাই হোক, কোথাও ক্যাম্প করা হলে আমাদের দলের প্রতিটী সদস্যের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হতো। "ক্ষুদে গোলক"কে হতে হতো "পাচক" যার কাজ ছিল শুধু আগুন জালিয়ে জল ফোটানো! আর সবাই আমরা বেরিয়ে যেতাম বুনো ফলমূল জোগাড করতে। না বললেও চলে ঐ খাদ্যদ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করাই ছিল দায়। কিন্তু তা পাওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়াতো—কারণ আমাদের আগে যে সৈন্যরা গেছেন তারা মানুষের মুখে দেওয়ার যোগ্য সবকিছু ঝেটিয়ে নিয়ে গেছেন। মাইলের পর মাইল হেটেও মুখে দেওয়া যায় এমন কিছু পাওয়া দুর্ঘট হতো। প্রতিটী পা হিসাব করে ফেলতে হতো—তা না হলে সেই জলাভূমিতে তলিয়ে যাওয়া ছিলো অবধারিত। এই বিপদ এড়াবার জন্য আমরা হাতে হাতে ধরে বা একটা লম্বা লাঠিতে সবাই হাত দিয়ে ধরে এগোতাম।

বুনো ফলমূলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসার পর সবাই মিলে সেগুলো খোসা ছাড়িয়ে খাবারের মতো করে নিতাম...তারপর সেই "খাদ্যদ্রব্যগুলোকে" সেদ্ধ করে নেওয়ার পর যখন হলদে হয়ে উঠতো তখন দলপতি বার্লি ও গমের ব্যাগ থেকে সামান্য কিছু বের করে তা ঐ জলে ছেড়ে দিতেন। প্রতিটি গমের দানাকে বহুমূল্য দ্রব্য জ্ঞানে গুণে গুণে জলে দিতেন। তারপর সবাই গোল হয়ে আগুণের চারপাশে বসে কথাবার্তা বলতে বলতে, হাসিখুসি করতে করতে পরম আনন্দে সেই খাবার ভাগ করে নিতাম।

"আঃ, একেবারে বার্লি মেশানো গরুর মাংসের ষ্টুর মতো লাগছে!'

"ধ্যেৎ, এটা হচ্ছে বার্লি-মেশানো সেদ্ধ করা পেঁয়াজ।"

ইত্যাকারের নানা মন্তব্য করা হতো আমাদের "খাদ্য" সম্পর্কে। অবশেষে দলপতি বলতেন: 'তোমরা সবাই ভুল করছো। এটা হলো 'আবার খাবো'

পিঠে। দেখছো না এতে বার্লি খেজুরের পরিবর্তে আর গমের দানা পদ্মফুলের বীজের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'আবার খাবো' পিঠেই বটে!" সবাই চারদিক থেকে এক-বাক্যে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতাম আর গোগ্রাসে যা ভাগে পড়তো তা চেটেপুটে খেতাম। বুনো ফলমূলের বিস্বাদের কথা আমাদের তখন মনেই পড়তো না।

সময়টা আগস্টের মাঝামাঝি হলেও জলাভূমিতে আবাহাওয়ার কোনো মাথামুণ্ডু ছিলো না। দিনের যে কোনো সময় আবহাওয়া দেখতে বদলে যেতো। হঠাৎ দেখা গেলো আকাশ জুড়ে হয়তো খণ্ড খণ্ড মেঘ হয়েছে; তারপরই হয়তো সূর্য ঢাকা পড়লো—আর আকাশ ভেঙে নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টি সারা তল্লাট জুড়ে। সঙ্গে চললো প্রবল দমকা হাওয়া। রাতটাই ছিলো সবচেয়ে বেশী ঝামেলার। তারাভরা আকাশ প্রায় দেখাই যেতোনা। যে কোনো মুহূর্তে নামতো বৃষ্টি শুরু হতো শিলাবৃষ্টি আর তুষারপাত।

ক্ষিধে ছাড়া প্রকৃতির সঙ্গেও আমাদের নিয়ত লড়াই করে চলতে হতো। ক্ষিধে শীত আর ক্লান্তি লালফৌজের প্রতিটি সৈনিকের মনোবলকে চরম পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাতো।

একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে আমরা একটা জায়গায় ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আগুন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছিলো আকাশে। কিছু বুনো ফলমূল সেদ্ধ করে আমরা তখন বেশ খোশমেজাজে আছি। চললাম শুয়ে পড়ার মতো জায়গার খোঁজে। একটা ঝোপের আড়ালে রাত কাটানোর মতো একটা জায়গাও পাওয়া গেলো। দলপতি বেজায় খুশি হলেন, বললে—"দেখো কমরেডরা, আজও রাতে, আর বসে বসে, ঝিমোনোর দরকার নেই। কিছু লতাপাতার ছাউনি দিয়ে তারপর তাঁবু খাটালে বেশ হয়। তাতে চমৎকার একটা ঘরের মতো হবে, তাই না?"

আমার মনে হলো খুবই উত্তম প্রস্তাব। বললাম, "আচ্ছা তাছাড়া কিছু ঘাস বিছানার নীচে বিছিয়ে দিলে কেমন হয়?"

সবাই বলল: 'দেখা যাচ্ছে, দশজনে মাথা খাটালে সব সময়ই ভালো একটা বুদ্ধি বেরিয়ে আসে।"

দেখতে দেখতে আমরা সবাই কাজে লেগে গেলাম। "আজ একটা 'কোঠা-বাড়ীতে' ঘুম দেয়া যাবে"—পাশ থেকে খোশমেজাজে "ক্ষুদেগোলক" মন্তব্য করলো।

কাজ সমাধা করে "বিছানায়" লম্বা হয়ে পড়লাম সবাই—একপাল শূকরছানার মতো।

কিন্তু এতো আরাম কপালে সইলো না। মাঝরাতে ধড়ফড় করে উঠে বসতে হলো, ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো সবার। বসে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলাম সারা তল্লাট জুড়ে আকাশ কালো হয়ে রয়েছে -ঘন কুয়াশার মতো নেমেছে। চারদিকে এমন অন্ধকার যে নিজের বাড়ানো হাতকেও দেখা যায় না। ঝড় আসছে বোঝা গেলো। দূর থেকে বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ শোনা গেলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হলো।

আমার অন্য চার বন্ধু ততক্ষণে উঠে বসেছে। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ওরা ভীষণ বিরক্ত! দলপতি বললেন: "কপাল মন্দ, বৃষ্টিটা আর সময় পেলো না!"

একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় আমাদের "কোঠাবাড়ির" ছাদটিই উড়ে গেলো। এই অবস্থায় আমরা পিঠে পিঠ দিয়ে আমাদের দেহের উত্তাপ দিয়ে নিজেদের গরম রাখতে চাইলাম। এদিকে বৃষ্টি পড়ছে, খেজুরের মতো মোটা মোটা শিলাবৃষ্টির হাত থেকে বেতের টুপিগুলো মোটেই রক্ষা করতে পারছিলো না। শীতে আমরা তখন হু হু করে কাঁপছি, দাঁতে দাঁতে লেগে শব্দ হচ্ছে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো একটু টান করে নিচ্ছি। তা না হলে একবার পায়ে খিল ধরে গেলে উঠেই দাঁড়াতে পারবো না।

সকাল পর্যন্ত একটানা এই শিলাবৃষ্টি চললো। তারপর ধীরে ধীরে তা কমে এলো। আমরা উঠে দাঁড়ালাম সবাই, তাঁবুটা গুটিয়ে, ভেজা জিনিসগুলো শুকোবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর সামান্য বুনো ফলমূল খেয়ে আবার রওয়ানা দিলাম।

এই একটানা চলা, ক্ষুধে আর এই প্রচণ্ড শীত প্রত্যেকের সামনে বিরাট এক পরীক্ষার মতো হয়ে দাঁড়ালো। এদিকে খাবার একেবারে শেষ হয়ে এলো। অন্যান্য কমরেডদেরও সেই এক অবস্থা, খাবারের উপযোগী বুনো ফলমূল বা ঘাস খুব কমই মিললো।

এতো সব বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আমোদপ্রমোদের আয়োজন আমরা জোরে সোরে চালিয়ে যেতে লাগলাম এবং তাতে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এলাম। পেটে গামছা বেঁধে ক্লান্ত দেহে চলতে হলেও কথাবার্তা, গান, গল্প, উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও ছড়া ইত্যাদি আমরা চালিয়ে যেতাম।

মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় আমাদের সৈনিকদের একটি কোম্পানী ক্যাম্প করে আছে দেখলাম। "বাচ্চাদের দল"-কে ওরা সহর্ষে স্বাগত জানালেন।

সন্ধ্যাবেলা একটা আসর বসলো। আমরা বড়ো করে একটা আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে সবাই গোল হয়ে বসলাম।

প্রথম বিষয়ই হলো "বাচ্চাদের নৃত্য"। আমাদের শ্রোতাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমরা শুরু করলাম। প্রথমেই গান ধরলাম: "মাংস দিয়ে পেটের পুজো, ব্যাপারটা মন্দ নয়! কিন্তু যদি বেশী গেলো, ফাঁপর কিন্তু কম হবেনা; জেনে রেখো!"

গান শেষ হওয়া মাত্র চারিদিক থেকে তুমুল করতালি আর হাসির ধ্বনি উঠলো। সৈনিকেরা সবাই আমাদের করমর্দন করতে ছুটে এলেন। মোটা মতো একজন সৈনিক "ক্ষুদেগোলক"কে একপাশে ডেকে নিয়ে অনেক্ষণ পকেট হাতড়ে একমুঠো বার্লির পাঁপড় বের করলেন।

"ভাইটি, এইটুকু তুমি নাও"—এই বলে "ক্ষুদে গোলক"কে তা নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

কিন্তু এই মহামূল্য দান "ক্ষুদে গোলক" কেমন করে নিতে পারে?

"তুমি খাবে কী?"

"ও নিয়ে ভেবো না, আমি চালিয়ে নেবো। বেশ ক'দিন কিছু না খেলেও আমার চলে যাবে!" শেষ পর্যন্ত "ক্ষুদে গোলক"-কে তা' নিতেই হলো।

তারপর সৈনিকরা সবাই মিলে গলা ছেড়ে গান ধরলেন:

লাল ফৌজের সামনে বড়ো তিনটি কাজ:
সাম্রাজ্যবাদকে করতে হবে খতম;
সামন্তরাজ শেষ করে করবো কৃষকরাজ,
শ্রমিকশ্রেণীর রাজ, কায়েম হবে আজ।
যে যার দেবে সাধ্যমতো, নেবে তার লাগবে যতো ততো!

গানটা সারা অন্ধকার প্রান্তরকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুললো।

আমাদের ক্যাম্পে ফিরে "ক্ষুদে গোলক" তার উপহার পাওয়া বার্লির পাঁপড়টুকু দলপতির হাতে তুলে দিলো। তাদিয়ে স্যুপ বানিয়ে মনের আনন্দে সবাই খেলাম। তারপর তাঁবু খাটিয়ে পিঠোপিঠি শুয়ে টেনে ঘুম লাগালাম।

ঈ জনগণের সঙ্গে প্রথম দেখা

লেফটান্যান্ট-কর্ণেল আয়ের মুশিয়া

১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ইউয়েসি অঞ্চলের আমরা ঈ-জনগণ গরীব হান জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাং শাহীর নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে একই সঙ্গে হাইতাং, ওয়াংচিতাং এবং পাওয়ান এই তিনটি জেলা জুড়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়লেন। প্রায় চার হাজার লোকের আমাদের বাহিনীটি কুয়োমিনটাং এর ২৪নং বাহিনীর তিন তিনটি কোম্পানীকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো এবং তিনদিন ধরে প্রাদেশিক রাজধানী অবরোধ করে রাখলো। আমরা শহরে ঢোকার পর শিচাং থেকে শত্রুপক্ষের নূতন সৈন্য এসে পৌঁছলো—বাধ্য হয়ে আমরা পিছিয়ে এলাম এবং প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ১৯৩৫ এর এপ্রিলে ঐ পথ দিয়েই লালফৌজ আসছিল।

একটা খবর আমাদের কাছে এলো যে কুয়োমিনটাং ফৌজ ভেঙ্গে পড়ছে এবং শহরাঞ্চলের বড়ো বড়ো জমিদার ও ধনী লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালাতে শুরু করেছে। অনেকে বলেছিলেন—লালফৌজ কুয়োমিনটাং ও জমিদারদের শেষ করে দেবে এবং গরীব মানুষের ভালো করবে। আবার অন্যরা বলছিলেন—লালফৌজ অত্যাচারী নরহত্যাকারী লুটেরার দল মাত্র। লালফৌজ কি গরীবের হয়ে কুয়োমিনটাং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটা সৈন্যদল? না, তারাও কুয়োমিনটাং সৈন্যদের মতোই অত্যাচারী একটি বাহিনী? আমাদের জানার কোনো উপায়ই ছিলো না। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে আসার জন্য আমাদের তিনজন লোককে পাঠানো হবে।

তাঁদের রিপোর্ট থেকে একথা সত্য বলেই জানা গেল যে কুয়োমিনটাং সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে, ধনী পরিবারগুলো বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং লালফৌজের এদিকে এগিয়ে আসা প্রায় আসন্ন। আঞ্চলিক কুয়োমিনটাং কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের স্থান ত্যাগ করার জন্য জোরজবরদস্তি করছে—তারা এই অপপ্রচার চালাচ্ছে যে কমিউনিস্টগণ "সম্পত্তি, স্ত্রীলোক এবং সবকিছুকেই" সাধারণের সম্পত্তি করে দেবে। লালফৌজের ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর না নেবার জন্যও কুয়োমিনটাংরা লোকজনকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

কিন্তু লালফৌজ সম্পর্কে আমরা কতোটুকুই বা জানি? সবাই যে যার মতো করে একটা অনুমান করে নিয়েছিলেন। তবু একটা জিনিসই আমরা জানতাম যে তার কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তা না হলে এই জালিম আর হত্যাকরী কুয়োমিনটাংরা এমন প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে কেন? তাই যদি হয় তবে কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে লালফৌজের প্রতি সমর্থন জানানোই উচিত কাজ হবে না কি? এভাবে চিন্তা করে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আমরা প্রাদেশিক সদরের দিকে চললাম।

ইউয়েসিতে তখন এক চরম দুরবস্থা। কুয়োমিনটাং ও জমিদারদের যারা বিরোধিতা করছিলো তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কুয়োমিনটাং সৈন্যরা বিরোধী লোকদের ঘরবাড়ী লুঠতরাজ করছে। বহু বাড়ীঘর ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে তারা। ভাঙ্গা দরজা জানালা খোলা পড়ে রয়েছে। জনশূন্য পথগুলো ভাঙ্গা টালী, কাঠের টুকরো, খড় আর ছেড়া কাপড় চোপড়ে পরিকীর্ণ। নূতন দুর্যোগের ভয়ে বাকী বাসিন্দারা তাদের দরজা জানালা খিল দিয়ে রেখেছেন।

একদিন সকালে খোঁজ খবর নিতে নিতে একটা দোকানে আমরা লালফৌজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম এমন সময় দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলাম। উঁকি দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম পাঁচজন লোক ঘোড়ায় চড়ে আসছেন, দেখে তাদের সামরিক বাহিনীর তরুণ লোক বলেই মনে হলো, গায়ে তাদের কালো কুর্তা, মাথায় আটকোণ বিশিষ্ট লাল তারকা খচিত টুপি। কাঁধে তাদের রাইফেল ঝোলানো আর কোমরে কার্তুজের বেল্ট বাঁধা।

আমাদের দেখে ওরা নেমে এলেন ঘোড়া থেকে।

হেসে আমাদের দিকে আসতে আসতে বললেন: "বন্ধুগণ, আপনাদের যাই বলা হয়ে থাক না কেনো, আমাদের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছুই আপনাদের নেই।"

আমরা তবু ভরসা পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের বন্ধুসুলভ হাবভাব দেখে তাদের কাছে গেলাম।

"দেশবাসী ভায়েরা, ভয় পাবেন না। লালফৌজের লোক আমরা, সংখ্যা-লঘু জনগণের মঙ্গলের জন্য আমরা কাজ করি এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাং সৈন্যদের আমরা ধ্বংস সাধন করে থাকি।"

"লালফৌজ!" আমরা চমকে বলে উঠলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের

সেই লোকদের চারপাশে জড়ো হতে লাগলাম। হাতে হাত মিলিয়ে পরস্পরকে আমরা ভালো করে দেখে নিতে লাগলাম। তারা আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিলেন; আমরাও তাদের লালতারাটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম।

"আমরা খবর পেয়েছি যে, এখানকার ঈ ভাইদের (এই প্রথম এমন আন্তরিক সম্বোধনের ভাষা আমরা শুনলাম। উপর কুয়োমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীলরা ভীষণরকম অত্যাচার চালাচ্ছে। পালিয়ে যাওয়ার আগে শত্রুরা আমাদের সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার চালিয়েছে তাতে নিশ্চয়ই আপনারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা আশা করি আপনারা আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়েই যাবেন। আমরা এখানে ক'দিন থাকবো তবে আমরা এই গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনাদের কোনো প্রকার ক্ষতিই আমরা করবো না।"

হাসিমুখে আমাদের সাঙ্গ করমর্দন করে এর মাঝে ওখানে যে লোকজনেরা জড়ো হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে নিয়ে তারা শহরের নানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন।

ধীরে ধীরে শহরের দোকান পাট গুলো খুলতে লাগলো। লালফৌজের লোকজনদের এসে পৌছানোর সংবাদ মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বিকালের দিকে একটি সামরিক সঙ্গীত জোরে গাইতে গাইতে লালফৌজ শহরে এসে পড়লো শহরবাসীদের প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি ও উৎসুক দৃষ্টির সামনে দিয়ে। কিছু কিছু লালফৌজের লোকের বেসামরিক পোষাকও রয়েছে দেখা গেলো; তাদের সবাইকেই কিন্তু প্রাণবন্ত ও সতেজ মনে হলো; রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকজনদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে তারা হাত নাড়িয়ে চলেছিলেন। শূন্য ঘরবাড়ী গুলোতে তারা প্রবেশ করলেন না—সোজা শহরের প্রবেশ পথ পর্যন্ত এগিয়ে ওখানে বসে তারা বিশ্রাম করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু শহরবাসী তাদের চারপাশে এসে সমবেত হলেন: কিছু কিছু সৈন্য ঐ লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও শুরু করলেন; কেউ কেউ বাচ্চাদের কোলে নিয়ে তাদের আদর করলেন। ক্রমেই বেশী বেশী করে লোক এসে সেখানে জড়ো হতে লাগলেন, দেখা গেলো বেশ একটা লোকের ভীড় হয়ে গেছে। একজন সৈনিক তার কাঁধের ঝোলানো বন্দুক নিয়েই একটি ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে সমবেত লোকজনদের কাছে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন।

"দেশবাসী ভায়েরা! আমরা হচ্ছি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনের শ্রমিক কৃষকদের লালফৌজ। একদিন আমরা আপনাদের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল আমলা, জমিদার ও পুঁজিপতিদের দ্বারা নিপীড়িত গরীব মানুষ ছিলাম। যখন আর অত্যাচার সহ্য করতে পারছিলাম না তখন আমরা লাল-ফৌজে যোগ দিয়েছি। কুয়োমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের যদি আমরা উৎখাত করতে এবং সমগ্র চীনকে মুক্ত করতে না পারি, তবে কা'রো শান্তি ও সুখ সম্ভব হবে না। এখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ আক্রমণ করছে—কিন্তু চিয়াং কাইশেক সরকার তাদের প্রতিরোধ করছে না। জাতিকে বাঁচাবার জন্য আমরা জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছি। সকল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা যারা মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন তারা লালফৌজে যোগদান করুন।"

উপস্থিত লোকদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিলো। "সেনাবাহিনীতে যোগ দিন!" "প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন!" এবং "জাপানী সাম্রাজ্যবাদী" ইত্যাদি কথাবার্তা এদের কাছে একেবারেই নূতন জিনিস।

আমি একান্ত অভিভূত ও প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম —তারা যে যথার্থভাবে কুয়োমিনটাং দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই এসেছেন। আমি আমার নাম লালফৌজে লেখানোর ব্যাপারে রাজী হয়ে যাবো ভাবলাম। কিন্তু পরে মনে হলো আরো খানিকটা দেখা যাক, তখন না হয় একটা সিদ্ধান্ত নেবো।

"আরে দেখো, লালফৌজ জেলখানার গেট খুলে দিয়েছে, চলো, চলো, সবাই ওদিকে যাই।"

দেখতে দেখতে উপস্থিত সকলেই প্রাদেশিক সদর দপ্তরের দিকে চীৎকার করতে করতে ছুটে চললেন। যখন আমি এলাম, দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য। জেলখানার হলঘর এবং বারান্দার সামনে লোকজনেরা আগুন জ্বালিয়েছেন এবং লালফৌজের সৈন্যরা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দলিলপত্রের বাণ্ডিলগুলো সেই আগুনে এনে ফেলছেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছিলো। চারদিকে তখন "লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!" এই শ্লোগান উঠছে।

লালফৌজের একদল সৈনিক বিরাট একটা কাঠ বয়ে নিয়ে জেলখানার লম্বা

বিকটাকার লোহার গেটের সামনে এলেন। সবাই সেখানে থামলেন প্রস্তুত হওয়ার ভঙ্গীতে। তারপর তাঁদের একজন বললেন; "প্রস্তুত! শুরু করুন!"

ভীষণ একটা শব্দ হলো। বিরাট কাঠখানি গেটের ওপর আছড়ে ফেলা হলো। গেটটি প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো।

"লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক! লালফৌজের জয় হোক!"

উত্তেজনায় অধীর হয়ে আমি লোকের ভীড়ের সঙ্গে জেলের দিকে চললাম। ভেতরে ভীষণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা বীভৎস, বিকট গন্ধ আসছিলো! লালফৌজের লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে হাতুড়ী হাতে করে অবিচলিত চিত্তে ভেতরে ঢুকলেন এবং যেতে যেতে চীৎকার করে বলতে লাগলেন "দেশবাসী ভায়েরা, আপনারা কী সাংঘাতিক যাতনাই পেয়েছেন! আমরা লালফৌজের লোক, আপনাদের রক্ষা করতে এসেছি!"

তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেতরে গেলাম। কী ভয়াবহ দৃশ্য! কাঠির মতো জীর্ণদেহ, অগোছালো চুল, তারা উলঙ্গ বা অর্ধউলঙ্গ সবাই বা বড়ো একটুকরো ন্যাকড়া গায়ে জড়ানো, কাদা মাটি ও পচা জলের কুণ্ডের মধ্যে রয়েছেন ওরা। সকলকেই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, হাতে হাতকড়া লাগানো। কয়েকজন মরে পড়ে আছেন। লালফৌজের লোকেরা সাবধানে তাদের শৃঙ্খলগুলো খুলে দিলেন এবং তাদের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এলেন। আমরাও ক'জন এই কাজে তাঁদের সাহায্য করলাম। আমরা প্রায় দু'শ জনকে বের করে নিয়ে এলাম। বন্দীদের মধ্যে ইউয়েসি, পুসিয়াঙ্গগোল, আহৌ এবং কুয়োটি উপজাতির প্রধানেরাও ছিলেন। প্রায় বারো বছর ধরে ওরা জেলে ছিলেন। হাজার হাজার মানুষকে অত্যাচার করে শেষ করে ফেলেছে ওরা। কিসের জন্য এই অত্যাচার? তার কারণ হচ্ছে তারা ঈ'দের সঙ্গে ঈ'দের গোলমাল বাঁধাবার কুয়োমিনটাং নীতি মেনে নেননি; তাই তাদের এমন শাস্তি! তাঁরা অন্য উপজাতীয়দের মধ্যেকার তাঁদের ভাইদের হত্যা করতে রাজী হননি; "রীতি' অনুসারে কুয়োমিনটাং অফিসারদের তারা যুবতী মেয়ে সরবরাহ করেন নি; বা তারা অন্তহীন ভাবে বেড়ে চলা অসহ্য করের বোঝা মেটাতে পারেননি তাই তাদের এমন শাস্তি পেতে হয়েছিলো। অন্যদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কুয়োমিনটাং শাসকেরা তথাকথিত "পালাক্রমে শাস্তি প্রদানের" অদ্ভুত একটা ব্যবস্থা চালু করেছিলো। কোনো উপজাতির প্রধান উপরে

উল্লিখিত যে কোনো একটি "অপরাধের" জন্য "অপরাধী" হলে তার দীর্ঘ কারাবাসের শুরু হতো, ঐ উপজাতির পরপর সব ক'জন প্রধানকেই এবং তাদের ছেলে এবং নাতীদেরও পালাক্রমে এই শাস্তি ভোগ করতে হতো। আসলে যে কোনো মতেই মৃত্যু ছিলো একেবারে অবধারিত—হয় জেলে মরতে হতো অথবা পরে বাইরে এসে অত্যাচারের ও কারাবাসের পরিণামে মারা যেতে হতো। এভাবে বেশ কিছু উপজাতি গোষ্ঠী একেবারে নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিলেন।

এই করুণ দৃশ্য,—যারা বেঁচে ছিলেন তাদের দুরবস্থা আর মৃত ব্যক্তিদের ভয়াবহ ছবি,—উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মর্মন্তুদ আর্তনাদ ও করুণ কান্না জাগানো, ক্রমে ক্রমে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে থেকেও অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমিও চোখের জল দমন করতে পারছিলাম না। যারা বেঁচে গিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মীয় স্বজনেরা লাল ফৌজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন, মৃতব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনেরা কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছে এই মৃত্যু ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। লাল ফৌজের সৈনিকেরা জলভরা চোখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: দেশবাসী ভায়েরা, আপনাদের এই আস্থার কথা আমাদের মনে থাকবে আর কুয়োমিনটাং-এর রক্তমাখা হাতে যারাই নির্যাতিত হয়েছেন তাদের হয়ে বদলা নিয়ে কুয়োমিনটাংকে আমরা নিশ্চিহ্ন করবোই।"

আমার সারা মনে তখন প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছে, আমি আবেগভরে চীৎকার করে বললাম: "কুয়োমিনটাং এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আপনাদের ফৌজে যোগ দেবো।"

চারদিকে বিষণ্ণ পরিবেশটা আমার এই চীৎকারে ভেঙ্গে গেল। এক মুহূর্ত সবলেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনেকেই আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চীৎকার করে উঠলেন। "আমিও কুয়োমিনটাং এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের ফৌজে যোগ দেবো।" চারদিক থেকে এই রব উঠলো।

লালফৌজের লোকেরা করতালিধ্বনি করে আমাদের সিদ্ধান্তকে সহর্ষে স্বাগত জানালেন এবং পরে আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করে নেবেন বলে জানিয়ে দিলেন।

এদিকে লালফৌজের কিছু সৈনিক ওষুধের বাক্স, খাদ্য সামগ্রী, কাপড়-

চোপড়, তৈরী জামাপোষাকের বাণ্ডিল এবং বাস্কেট ভর্তি রৌপ্যমুদ্রা, তামার পয়সা ও অন্যান্য মুদ্রাদি নিয়ে হাজির হলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলী নিগৃহীত বন্দীদের লালফৌজের লোকেরা যে ভাবে যত্ন করে জামা পরিয়ে দিলেন এবং খাবার ইত্যাদি দিলেন তা দেখলেন। যারা অসুস্থ ছিলেন তাদের ওষুধপত্র ও অতিরিক্ত এক প্যাকেট কাপড় এবং প্রত্যেককে বারোটি করে রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হলো।

"প্রিয় দেশবাসী ভায়েরা!" কাঁধে বন্দুক বাঁধা সেই সৈনিকটিই আবার কথা বলতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রসস্ত মুখ, কালো পুরু ভুরু ছিলো তাঁর। খুবই অমায়িক ও মিশুক লোক। দেখামাত্র তাঁকে আমার খুবই ভালো লেগে গেল। তিনি বলে চললেন: "আপনাদের যা আমরা দিলাম সেই ভালো ভালো জিনিসপত্রগুলো আমরা কুয়োমিনটাং অফিসারবর্গ এবং জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে এনেছি—ঐ লোকেরাই সেগুলো শ্রমজীবী মানুষদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা জমা করেছিলো; আমরা সেগুলোই আপনাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম যাতে আপনারা ভালোভাবে বেঁচে থেকে উৎপাদনের কাজকর্ম করতে পারেন। কাল আমরা ফসলের গোলাগুলো খুলে দেবো। আমরা আশাকরি আপনারা বস্তা নিয়ে আসবেন; আজ যারা আসেননি তাদেরও আসতে বলবেন। সকলে মিলে আনন্দ করার সময়ই তো এটা।"

তাঁর বক্তৃতার পরই চারদিক থেকে আবেগ উচ্ছ্বসিত ধ্বনি উঠলো: লাল ফৌজকে অভিনন্দন জানাই!" "লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!"

পরে আমি জেনেছিলাম ঐ বক্তাটি রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা লিউ চি-চুন। তিনি আমাদের কোম্পানীর সদর দপ্তরে নিয়ে গেলেন। একজন ধনী লোকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ক্যাম্প করা হয়েছিলো। রাজনৈতিক শিক্ষক মাঝারি গড়নের ছোটো চোখওয়ালা একজন লোককে ডেকে পাঠালেন।

আমাদের দেখিয়ে তিনি তাঁকে বললেন: "এই তিনজন কমরেড আপনার স্কোয়াডে থাকবেন। তাদের খুব ভালো করো যত্ন নেবেন—ওরা তিনজনই ঈ জনগণের লোক।" আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "ভয় পাবেন না। আপনাদের নিজের বাড়ী ঘরের মতো লাগবে।" ছোটো-চোখ একজন ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন: উনি হলেন কমরেড হোশিয়াং-জুং, আপনাদের স্কোয়াড লীডার।" তারপর অন্যান্য নূতন কমরেডদের অভ্যর্থনা করুন!" স্কোয়াড

লীডারের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত আট জন যুবক উঠান থেকে ছুটে এলেন। তারপর শুরু হলো জলআনা, চা-ঢালা আর করমর্দনের পালা। একজন কমরেড একটা বাণ্ডিল নিয়ে এসে আমাদের প্রত্যেককে এক সেট করে পোষাক এবং একজোড়া করে খড়ের জুতো দিলেন। (মার্চ ও যুদ্ধ করার সময় সুবিধা-জনক হবে বলে পোষাকটি আমরা প্রয়োজন মতো ছাট কাট করে নিতাম। "এখন আমি একজন লাল ফৌজের লোক, কুয়োমিনটাংকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে!"— মনে মনে ভাবছিলাম।

তিনদিন পর সৈন্যদল রওয়ানা দিলো। সমস্ত শহরবাসী জড়ো হয়ে তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। সারা অঞ্চল জুড়ে লোক আর ধরেনা। লালফৌজের জন্য তারা অনেক উপহার নিয়ে এসেছেন— শূকরের মাথা, গোটা ভেড়া, গরুর মাংস আর মদ; ওগুলো গ্রহণ করার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করলেন। সৈন্যদল বার বার তা গ্রহণ করতে সবিনয়ে অস্বীকৃতি জানালো। আমি ভাবছিলাম—আমাদের আহত ও অসুস্থ কমরেডদের জন্যও কি মাংসের দরকার নেই? যখন একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে তখন ওগুলো আমাদের গ্রহণ করাই উচিত। বিশেষ করে বৃদ্ধ নরনারী চোখভরা জল নিয়ে আরো উপহার নিয়ে আসতে লাগলেন। "এখানে মাত্র ক'দিন থেকে লালফৌজ আমাদের জন্য কতো ভালো কাজ করে গেছেন! অথচ তাঁরা এক চুমুক মদও খাবেন না। এটা হতে পারে না"—এই ছিলো তাদের বক্তব্য।

নেতৃত্ব তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বললেন সারা পথ আমাদের লড়াই করে যেতে হবে। সঙ্গে অনেক লটবহর থাকলে পথ চলতে খুবই অসুবিধে হবে।

আসলে অস্ত্রপাতি আমাদের অল্পই ছিলো। পেটে ক্ষিধে রেখে কেন যে ওরা এভাবে করছেন বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু লোকরা নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলেন। তারপর বাধ্য হয়ে এক চুমুক করে হলদে মদ আমাদের খেতেই হলো। আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা সারা রাস্তার দুপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাদের সবাইকেই আমাদের সন্তুষ্ট করতে হচ্ছিলো।

এসময় একদল লোক তলোয়ার বর্শা আর লাঠি হাতে করে এসে আমাদের বাহিনীতে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। অনেক চেষ্টা করে তাদের বোঝানো হলো। যাই হোক এভাবে আমাদের দলে প্রায় চারশ বাড়তি শক্ত

সমর্থ নওজোয়ান যুক্ত হলেন। পেছনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সৈন্য-দলের সারিকে একটি অন্তহীন রেখার মতো দেখাচ্ছিলো।

দুদিন পরে হাইতাং এর কাছাকাছি এসেছি এমন সময় খবর এলো যে ওখানকার লোকজনেরা পলায়নরত কুমোমিনটাং প্রাদেশিক শাসককে আটক করে ঘিরে রেখেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইউয়েসির কুয়োমিনটাং পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা ও দুটো নিরাপত্তা বাহিনীকে আটকে রেখে আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছেন যাতে আমরা ওদের একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে পারি। আমার মনে পড়লো যে আমাকে এখনও কোনো রাইফেল দেওয়া হয় নি—স্কোয়াড লীডারকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন নেতৃত্ব মনে করেন নূতন সৈনিকেরা রাইফেল নিয়ে চলতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম দিকে কিছুদিন নূতন সৈনিকদের রাইফেল ছাড়াই চলতে দেওয়া হবে। আমি বার বার অনুরোধ করার পর হানইয়াং-এর অস্ত্র কারখানায় নির্মিত পুরানো একটা রাইফেল আমাকে দিলেন, তার সঙ্গে তিনটি কার্তুজ দেওয়া হলো তবে তারমধ্যে একটি আবার একেবারেই অকেজো।

হাইতাং এর উপকণ্ঠে এসে পড়লাম আমরা। শত্রুদের সঙ্গে আমাদের আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা ভেবে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলাম—এমন সময় স্কোয়াড লীডার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন আমরা যেহেতু নূতন লোক তাই আমাদের উচিত পুরনো কমরেডরা কেমন করে লড়াই করেন তা প্রথমে লক্ষ্য করা। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম এবং বললাম : "আমি কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি, লড়াই দেখার জন্য আসিনি।"

স্কোয়াড লীডার আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন কিন্তু আমি আমার বক্তব্যে অনড় হয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন : "কমরেড আয়ের মুশিয়া, তুমি এখন সেনাবাহিনীতে রয়েছো, তুমি তো নাগরিক মাত্র নও। তোমাকে এখন আদেশ মেনে চলতেই হবে।" আমি ভাবলাম : কথাটা তো ঠিকই, আমি তো এখন লালফৌজেরই লোক।" যাক্ পেছনে সরে এলাম, কিন্তু বলতেইহবে আদেশটা খুব খুশী মনে আমি মেনে নিতে পারিনি।

যখন হাইতাং পৌছালাম, সব জায়গাতেই ঈ ভাইদের দেখতে পেলাম! তারা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছেন। তারা তাদের কাপড় উড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। যুদ্ধ যখন শুরু হলো খুব জোর এবং সাংঘাতিক

গোলাগুলি বর্ষিত হলো। শত্রুরা মাটির দেয়ালের এবং রক্ষাব্যূহের আড়ালে থেকে ভীষণ প্রতিরোধ রচনা করলো। এমন সময় লক্ষ্য করলাম একজন শত্রু-সৈন্য আমাদের স্কোয়াড লীডারকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করেছে—আমি ঠিক সময়েই তা লক্ষ্য করলাম। স্কোয়াড লীডার তখন তাঁর রাইফেল নূতন বুলেট ভরছিলেন। আমি আমার বন্দুকটি তুলে সোজা শত্রুসৈন্যটিকে গুলি করে দিলাম। সে গুলি খেয়ে ধপ করে দেয়ালের পাশে পড়ে গেল। পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনে স্কোয়াড লীডার চমকে পেছনে ফিরে আমাকে দেখে তখনি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটি কথা না বলে তিনি অন্যদের সঙ্গে মিলে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রাদেশিক শাসক ও কুয়োমিনটাং-এর প্রাদেশিক পার্টির চার-জন নেতা বন্দী হলেন। কুয়োমিনটাং নিরাপত্তা বাহিনীর যে দুটো কোম্পানী পালিয়ে গিয়েছিলো ঈ জনসাধারণ তাদের পিছু ধাওয়া করে ধরে নিয়ে এসে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

হাইতাং-এর অধিবাসীদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের ঘরদোর জনশূন্য, দরজা, জানলা ভাঙ্গা, আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর হয়ে আছে, নানারকম জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। একটা বাড়ির সামনে পা দিয়ে কিছু ভাঙা জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়ার পর তার নীচ থেকে ছোট, চমৎকার, সুন্দর একটা মদ্যপানের পাত্র বেরিয়ে এলো। আমি আমার ঝোলার মধ্যে তা রেখে দিলাম পরে মদ খাওয়ার সময় কাজে লাগাবো মনে করে। আমি এভাবে ঘোরাফেরা করছিলাম এমন সময় স্কোয়াড লীডারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাকেই খুঁজছিলেন। একটা মদের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা দেখলাম কয়েকটি মদের ভাণ্ড ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। ঐ ভাণ্ডগুলো থেকে মদ চুইয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, চারদিকে মদ ছড়িয়ে পড়ছে, কয়েকটি ভাণ্ডের দেখলাম ঢাকনাও নেই। তা থেকে প্রাণ মাতানো গন্ধ বের হচ্ছিলো। কাউণ্টার থেকে একটা ভাঙ্গা মদের পাত্র তুলে নিয়ে খোলা ভাণ্ড থেকে যখন তা মুখে দিতে যাচ্ছি—স্কোয়াড লীডার আমাকে থামিয়ে দিলেন, বললেন: "কমরেড আয়ের মুশিয়া, তুমি হচ্ছো লালফৌজের একজন সৈনিক. যে মদ অন্যের জিনিস তা তোমার পান করা তো উচিত নয়।" আমি মদ খেলাম না, কিন্তু কারণটা ভাল বুঝলাম না। ভাবলাম—স্কোয়াড লীডার বড়ো কড়া লোক। মদ তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে তা থেকে সামান্য একটু খেলে এমন কী ক্ষতি হবে?

স্কোয়াডের একটা সভা হচ্ছিলো। লীডার আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন আগামী দিনগুলোতে অভিযান চলাকালে ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় কী কী নিয়ম-কানুন আমাদের মেনে চলা উচিত। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলছিলেন পার্টির জাতিসত্তা সম্পর্কিত নীতি ও জনসাধারণ সম্পর্কিত শৃঙ্খলাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা দরকার।

"আমার নিজের সমালোচনাও আমি করতে চাই"—কথাগুলো বলার সময় তাঁকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। "গত কিছুদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহে খুবই ব্যস্ত থেকেছি—এবং তাতেই সবটুকু মনোযোগ দিয়ে বসেছিলাম। নূতন কমরেডদের যত্ন নেওয়ার, সাহায্য করার, তাদের শিক্ষিত করে তোলার কথা ভুলেই ছিলাম। আজ কমরেড আয়ের মুশিয়া··· "

আমি লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেললাম। সমস্ত কমরেডরা আমার দিকে তাকালেন।

"কমরেডগণ, ওকে দোষ দেবেন না। আমি এবং পুরানো কমরেডরাই দোষী। আমরা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিনি। তিনটি শৃঙ্খলা ও দশটি মনোযোগের বিষয় এবং পার্টির জাতিসত্তা সম্পর্কিত নীতি ও জানে না।"

পুরনো যোদ্ধারা মাথা নুইয়ে ফেললেন। কিন্তু এতে মাথা নোয়াবার কী আছে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ যখন ঘুরে বসতে যাচ্ছিলাম আমার ব্যাগ থেকে মদ্যপানের সেই পাত্রটি পড়ে গেল। সবাই পাত্রটির দিকে তাকালেন। "এই পাত্রটি এলো কোথা থেকে ?"—সবাই যেন জানতে চাইছেন।

আমি ভাবলাম একটা ছোট বিষয়কে নিয়ে এত ফোনয়ে কী লাভ? মন খুলে বলে ফেললাম: "পথে আবর্জনার স্তূপ পা দিয়ে সরাতেই ঐটি পেয়ে গেলাম। ভাবলাম আমি যদি তা নাও নিই অন্য কারো পায়ের চাপে তা গুঁড়িয়ে যাবে। তাই তুলে নিলাম।"

গোঁয়ার গোবিন্দের মতো একজন কমরেড আমার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বললেন: "তুমি লালফৌজের সুনামকে কলঙ্কিত করেছো।" কিছু কিছু কমরেড এই ঘটনায় দুঃখিত বোধ করলেন; অন্যরা রীতিমতো চটেমটে গেলেন।

স্কোয়াড লীডার চীৎকার করে বললেন: "কমরেডগণ, একটু থামো তো সবাই!" এতে চারদিকের উত্তাপ খানিকটা কমে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "কমরেড আয়ের মুশিয়া, আমরা লালফৌজের লোকেরা সমগ্র মনে

প্রাণে জনগণের সেবায় নিযুক্ত। তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস আমরা নেবো না, নিই না। আজ তুমি আমাদের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ করেছো। যদিও আবর্জনাস্তূপের মধ্যেই কাপটি পেয়েছো—কিন্তু এটা অন্য লোকের জিনিস। কোনো মতেই তার স্থান তোমার ব্যাগে হতে পারে না। কথাগুলো মনে রেখো, ভবিষ্যতে আর ওরকম করো না। কুয়োমিনটাং দস্যুরা জনগণকে অত্যাচার করার শিক্ষাই দেয় আমরা তো ওদের মতো হতে পারিনা। এই কাপটি তোমার কাছেই রাখো।" তিনি খুবই মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন—এবং তাঁর ছোট ছোট চোখ দিয়ে তিনি শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়েই ছিলেন।

স্কোয়াড লীডারের কথা শুনছিলাম, আর কুয়োমিনটাং দস্যুরা নরহত্যা করছে, সব কিছু জালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে এইসব দৃশ্যের পাশাপাশি লালফৌজ জেলখানা খুলে বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছে, শস্যের গোলা থেকে শস্য ঈ এবং গরীব হানভাইদের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছে সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়তে লাগলো! অন্য মানুষের কাছ থেকে একটা সাধারণ কাপও লাল ফৌজ আমাকে নিতে দিচ্ছে না। এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে আমি অন্যায় করেছি।

ঐদিন সন্ধ্যায় রান্না করার মতো যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ ছিলোনা। বহু কমরেডকে কাঠ কিনে আনতে পাঠানো হলো কিন্তু কোথাও কাঠ পাওয়া গেলো না। আমি যেহেতু স্থানীয় লোক তাই বাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষক আমাকে স্কোয়াড লীডারের সঙ্গে কাঠের খোঁজে যেতে বললেন। চারদিক অন্ধকার—বহু অধিবাসী তখনও ফিরে আসেন নি। নানা জায়গায় একটা বাতি হাতে নিয়ে খোঁজ খবর করলাম। শেষ পর্যন্ত একটি বাড়ীর উঠোনে তিন বোঝা জ্বালানি কাঠ পাওয়া গেলো। তিনটি বোঝা এক সাথে বেঁধে ঝটপট আমার কাঁধে তুলে চলে যেতে উদ্যত হলাম। আমি বললাম: "রান্নার লোকদের তাড়াতাড়ি কাঠের দরকার। আমরা কিছু পয়সা এনে পরে ওখানে রেখে গেলেই তো হয়।"

খানিকক্ষণের জন্য স্কোয়াড লীডার দ্বিধায় পড়লেন। আমাকে ওখানে দাঁড়াতে বলে তিনি পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের কাছে এ ব্যাপারে নির্দেশ চাইতে গেলেন। এতো খুঁতখুতে স্বভাবের জন্য তাঁর ওপর খুব রাগ হলো। কোম্পানী সারাদিন মার্চ করে এসেছে, সকলেরই ভীষণ খিদে পেয়েছে, অথচ তিনি অনর্থক দেরী করছেন।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজন এলেন। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের হাতে একটা

বড়ো দাড়িপাল্লা, স্কোয়াড লীডারের হাতে তিন বাণ্ডিল কাপড়। আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না ওরা কী করতে যাচ্ছেন। কমরেড ইনস্ট্রাকটর আমাকে আলোটা তুলে ধরতে বললেন আর তিনি এবং স্কোয়াডলীডার কাঠগুলো ওজন করতে লেগে গেলেন। তারপর একটা কাগজে কী লিখলেন এবং আমাকে পড়ে শোনালেন: "দেশবাসী বন্ধুগণ! আমরা লালফৌজের লোক। আপনাদের উঠোন থেকে তিন বোঝা জ্বালানি কাঠ নিয়ে যেতে হলো বলে আমরা দুঃখিত ;— অনেক চেষ্টা করেও আমরা কাঠ কিনতে পেলাম না। এখানে জ্বালানি কাঠের দাম কতো না জানায় ১২০ কেটি (৬০ কে, জি) কাঠের বিনিময়ে তিন বাণ্ডিল কাপড় রেখে গেলাম। যদি আপনারা মনে করেন তা যথেষ্ট নয়, তাহলে আমাদের পরে যে লালফৌজ আসছে তাঁদের কাছে ঐ চিরকুট খানি নিয়ে যাবেন তাঁরা বাড়তি দাবী মিটিয়ে দেবেন।—চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের ফার্স্ট ফ্রন্ট আর্মির প্রথম আর্মির চতুর্থ ডিভিশনের দ্বাদশ রেজিমেন্টের পঞ্চম কোম্পানী; মে—১৯৩৫"। এখানে ওখানে আরো ক'টি কথা যোগ করে ইনস্ট্রাকটর কাপড়ের ভাজের মধ্যে ঐ চিরকুটখানি রেখে, ভালো করে বেঁধে তা' সাবধানে দরজার পেছনে ঝুলিয়ে রাখলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে তিনি আমাদের নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলা অনুসরণের আদর্শ ব্যবহার দেখে আমার গভীর শিক্ষা হলো।

আমরা পরদিন সূর্য ওঠার আগেই তাসহুপাও-এর দিকে রওয়ানা দিলাম। নরনারী নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোক আমাদের পথের দুপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। আসহুপাও পৌঁছার পর আমাদের তাতুনদী পার হতে হবে। এই খবর যখন তাদের জানানো হলো, স্থানীয় লোকেরা দাবী করতে লাগলেন যে তারাও নদী পার হয়ে আমাদের সঙ্গে যাবেন। তাদের ধীরে সুস্থে ভালো করে বোঝানো হলো—এবং তাদের মধ্য থেকে জন বারো চালাক চতুর ঐ যুবককে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে নিয়ে তাদের সবাইকে যার যার ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালাম। নদী তীরে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি শত্রুরা সব ক'খানি নৌকোই ধ্বংস করে ফেলেছে। ঐ রাতের মধ্যেই জনসাধারণ কাঠ নিয়ে এসে অনেকগুলো ভেলা বানিয়ে দিলেন আমাদের জন্য।

পরদিন ভোরে নদী জুড়ে ঘন কুয়াঁসা আঁধার হয়ে নেমেছে। সৈন্যরা নদী পার হতে শুরু করলেন। প্রথম দলটি ভেলায় উঠলেন। ঐ জনগণ দলে দলে

নদীতীরে দাঁড়িয়ে অশ্রুভরা চোখে আমাদের সৈন্যদের নদীর ওপারে চলে যাওয়া দেখছিলেন। তারা চীৎকার করে বলছিলেন: "আবার কিন্তু ফিরে আসতে হবে।"

যারা তখনো ভেলায় উঠেন নি তারা ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খাচ্ছিলেন।

বৃদ্ধ নরনারীরা অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করছিলেন: "কতো দিন পরে তা হলে তোমরা ফিরবে?"

আমাদের চোখে জল। সত্যি কথা বলতে কী—ওদের ছেড়ে আসতে আমাদেরও ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। শেষ সৈনিকরা যখন ভেলায় উঠলেন—তখন অনেকে অঝোরে কাঁদছিলেন।

"বিদায় দেশবাসী ভায়েরা। আপনারা দয়া করে ফিরে যান আপনাদের ঘরে"—বিদায় বেলায় হাত নেড়ে আমরা তাদের বলছিলাম। আরো অনেকেই তখন কাঁদছেন; তাঁরা চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"তোমাদের কিন্তু আবার আসতে হবে।"

"দেশবাসী ভায়েরা! এখন ঘরে ফিরুন, আপনাদের নির্দেশ আমাদের মনে থাকবে।"

সৈন্যরা অপর পারে অবতরণ করলেন এবং অগ্রসর সাথীদের অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন। জনসাধারণ কিন্তু তখনো নদীতীরে দাঁড়িয়েই আছেন। প্রশস্ত নদীটির অপর পার থেকে তাদের করুণ আহ্বান তখনো শোনা যাচ্ছিলো: "তাড়াতাড়ি · ফিরে·· এসো·· কিন্তু '

হাঁটতে হাঁটতে পেছনে ফিরে ফিরে দেখছিলাম। কুয়াশা কেটে গেছে, নদী তীরের জনতা ক্রমেই দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়ছেন। চোখে তখন কুয়াশা আমাদের! চোখ মুছে মুছে আমরা এগিয়ে চললাম। অনেক দূর চলে আসার পরও পেছনে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম।

হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন

মেজর কাও চেং-ভে

লং মার্চের সময় লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর একানব্বই নম্বর ডিভিশন ১৯৩৫ সালের বসন্তকালে সিকাং-এর গোল্ডেন লামা মন্দিরে এসে পৌঁছেছিলো। মন্দির থেকে নব্বই লী অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে পোপা নামক একটা গ্রামে ডিভিশনের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। আমি তখন ঐ ডিভিশনের প্রচার দপ্তরে কাজ করছিলাম

পোপা ছিলো ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো গ্রাম। গ্রামে প্রায় নয় শ' তিব্বতীয় পরিবার পাথর দিয়ে তৈরী চৌকো মতো মজবুত ঘরগুলোতে বাস করতো। আমাদের সৈন্যদল এসে পৌঁছাবার আগেই তিব্বতীয়রা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দরজায় দরজায় ঝোলানো লাল বস্ত্রখণ্ড থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে ঘরগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে— মন্ত্রপূত নিষেধাজ্ঞা ঝোলানো হয়েছে, কোনো কোনো ঘরে তালাও দেওয়া হয়েছে। উঠোনগুলো একেবারে ফাঁকা, মাঝে মাঝে কোথাও হয়তো কিছু জ্বালানি কাঠ পড়ে রয়েছে। সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা ওদের ঘরগুলোতে প্রবেশ করবো না, খোলা মাঠে গ্রামের বাইরেই ক্যাম্প করা হবে।

বসন্তের প্রথম দিকে তখনো বেশ শীত, গায়ে কাঁপুনি ধরে যায়। রাতে খোলা জায়গায় ঘুমিয়ে থাকাটাই ছিলো সবচেয়ে কষ্টের,—যে আগুন জ্বালানো হতো তাতে সামনের দিকের লোকদের সুবিধা হলেও—পেছনের লোকরা হিমে একেবারে জমে যেতেন। স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর কিছু খড় বিছিয়ে খানিকটা সুরাহার চেষ্টা করা হতো।

খাবার সংগ্রহ করাই ছিলো সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা কারণ ঘাসের মূল বা গাছের বাকলও সকলের জন্য যোগাড় করা সম্ভব হতো না। প্রতিদিনই আহত ও অসুস্থের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো।

আমরা ওখানে ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে, শক্তি পুনরুদ্ধার করে, নিজেদের পুনর্গঠিত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

এতো জানা কথা, ফলকে তার বোঁটা থেকে, সন্তানকে তার মার কাছ থেকে আলাদা করলে চলে না। লালফৌজ তাই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কী করে টিঁকে থাকতে পারে? এর আগে কোনো সৈন্যদল এখানে আসেনি এবং আমরা যে জনগণের একটি সৈন্যদল, তিব্বতীয়রা তার কোনো খোঁজই রাখতো না। সৈন্যদল আসছে এই খবর পেয়েই প্রধান ব্যক্তিটি ওদের পাহাড়ে নিয়ে চলে গেছেন আর সঙ্গে ক র তাদের ভেড়ার পাল ও গরুবাছুরগুলোকেও নিয়ে গেছেন। মন্দিরের লামারাও উধাও হয়েছেন।

শক্তি সঞ্চয় করতে হলে সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। নেতৃত্ব আদেশ জারি করে জনগণ সম্পর্কিত শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে মেনে চলতে বলে দিলেন; সংখ্যালঘু জনগণের রীতিনীতি ও আদবকায়দার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাতে বলে দেওয়া হলো। দরজায় ঝোলানো লাল বস্ত্রখণ্ড এবং মন্ত্রপূত দ্রব্যাদি অক্ষত রেখে দিতে বলা হলো। বলে দেওয়া হলো—প্রতিদিন পরিষ্কার করে রাস্তাঘাট ঝাট দিতে হবে এবং আমাদের প্রচারকারী দল দোভাষীদের সঙ্গে নিয়ে (আমাদের সঙ্গের হানদের মধ্যে যে কজন তিব্বতীয় ভাষা জানতেন তাদের এক দু'জনকে প্রত্যেক দলে নিয়ে) সর্বশক্তি দিয়ে স্থানীয় লোকজনদের খুঁজে বের করে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের প্রচার বিভাগকে আমরা ক'টি দলে ভাগ করে নিলাম। কয়েকজন বড়ো বড়ো করে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে ভালো করে দেখা যায় এমন জায়গায় লালফৌজের "তিনটি শৃঙ্খলা বিধি এবং অবশ্য পালনীয় আটটি কর্তব্য" ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি পার্টির নীতির কথা লিখে রাখলেন। কয়েকজন পাহাড়ে গেলেন জনগণের খোঁজে। প্রতিটি অভিযানে তিনচারদিন কাটতে লাগলো, আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে অথবা উন্মুক্ত তৃণভূমিতেই রাত কাটাতাম। মাঝে মাঝে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পেতাম, গরু ভেড়ার টাটকা লাদ চোখে পড়তো—কিন্তু জনমানুষের ছায়াও দেখতে পেতাম না।

এভাবে দশ বারো দিন কেটে গেলো। তারপর ভাগ্যক্রমে একটা পর্বত গুহার দোরগোড়ায় এসে পড়লাম—এখানেই তিব্বতীয়দের প্রধান ব্যক্তিটি লুকিয়ে ছিলেন। অনেক বোঝানোর এবং প্রচার অভিযানের পর বুঝলাম তাঁর একটা ঘোড়ার দরকার। আগের দিনে হলে আমাদের পক্ষে ওটা কোনো

সবত্তাই হতো না ; কিন্তু এখন সব ক'টি ঘোড়াকেই কেটে খেয়ে নিতে হয়েছে শুধু একটি রয়েছে ডিভিশন কমাণ্ডারের ব্যবহারের জন্য। ওখান থেকে ফিরে এসে যখন একথা তাঁকে জানালাম তিনি তখনই ঘোড়াটি তিব্বতীয় প্রধানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ তাঁর আর্দালিকে দিলেন।

উপহারটি পেয়ে প্রধান বেজায় খুশি। কিন্তু সকল সংশয় তাঁর তখনো দূর হয় নি। তিনি আমাদের সঙ্গে ক'জন লোক পাঠালেন সব দেখেশুনে যাওয়ার জন্য। ঐ লোকেরা গ্রামে ঢুকতেই গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগানগুলো দেখতে পেলেন এবং দেখলেন ঘরদোরের তালাগুলো, দুয়ারে দুয়ারে ঝোলানো লাল বস্ত্রখণ্ডগুলো এবং মন্ত্রপূত জিনিসগুলো ঠিকই রয়েছে, খোঁপেখাপে লুকিয়ে রাখা একটা জিনিসও লোপাট হয়নি, রাস্তাঘাটগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমরা গ্রামের বাইরে খোলা জায়গায় আস্তানা গেড়েছি, জংলী ফলমূল সেদ্ধ করে খাচ্ছি—তারা তখন সত্যিই আশ্বস্ত বোধ করলেন, অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে তারা আমাদের বিনয় নমস্কার জানালেন। ক'জন তো বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে পাহাড়ে ছুটে গেলেন এবং প্রধানের কাছে ও তাদের আপনজনদের কাছে গ্রামে যা যা দেখে গেছেন তা সবিস্তারে বললেন।

পাহাড় এবং তৃণভূমি থেকে তিব্বতীয়রা একে একে গ্রামে ফিরে আসতে লাগলেন, তাঁদের প্রায় ৩৭,০০০ ভেড়া ও গরুবাছুরের পিঠে বার্লির বস্তা এবং বার্লি ও মাখনের তৈরী চানপা নামক খাবারের বোঝা চাপিয়ে তাঁরা গ্রামে ফিরে এলেন। প্রধানকে সামনে রেখে একে একে তাঁরা ঘরদোরগুলো খুলতে লাগলেন এবং আমাদের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। লুকিয়ে রাখা ভাজা মাংস বের করে তাঁরা আমাদের তা' উপহার দিলেন। তারা আমাদের তিন'শ ভেড়া ও গরু দিলেন।

তিব্বতীয়দের রীতিনীতি জানা ছিলো না ; আমরা সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। তাঁরা এতে ভীষণ অখুশি হলেন। তাঁদের লবণ নেই দেখে আমরা সবাই আমাদের সবার ভাগ থেকে কিছু কিছু একত্র করে তাঁদের দিতে গেলাম। তাঁরা তা নিতে রাজী হলেন না। দোভাষীর মাধ্যমে জানলাম যেহেতু আমরা তাঁদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করিনি তাই তাঁরা মনে করছেন

আমরা তাঁদের প্রতি বাইরের লোকের মতো ব্যবহার করছি। আমরা তখন তাঁদের দেওয়া উপহার সামগ্রী বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলাম, তাঁরাও আমাদের দেওয়া লবণ গ্রহণ করতে রাজী হলেন; এভাবে আমরা এক পরিবারভুক্ত লোকের মতো হয়ে গেলাম। আমি গুয়েই নাম্নী এক বৃদ্ধার ঘরে থাকতাম—গ্রাম আর পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ছিলো তাঁর বাড়ী। শক্ত সমর্থ ঐ বৃদ্ধার দু'টি ছেলে। একজন পশুপালনের খামারে কাজ করতো—প্রায়ই বাড়ী আসতো না। ছোট ছেলেটির বয়স কুড়ি হবে, থাকতো মার সঙ্গেই। বড় বোনকে একজন সর্দার জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে—ঐ কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন। আমার সঙ্গে বৃদ্ধা মহিলাটির খুবই সদ্ভাব হয়ে গেলো। প্রতিদিন সূর্য ওঠা'র আগেই আমি আর প্রচার বিভাগের চ্যাং হুং নামের "ছোট্ট ছেলেটি" পাহাড়ের নীচে থেকে গিয়ে জল নিয়ে আসতাম এবং বৃদ্ধা ঘুম থেকে ওঠার আগেই তাঁর জন্য জল গরম করে রাখতাম। মাঝে মাঝেই বৃদ্ধা বলতেন আমরা নাকি তাঁর "ছেলেদের চেয়েও অনেক ভালো।" তারপর তিনিই অন্য মেয়েদের নিয়ে সংগঠিতভাবে আমাদের সেনাবাহিনীর ছেড়া জামাকাপড় রিপু ও সেলাই করে দেওয়া এবং কাপড়-চোপড় কাচার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর একদিন যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে গ্রামের পাশেই প্রায় শ'খানেক আহত ও অসুস্থ সৈনিক রয়েছেন; তিনিই উদ্যোগী হয়ে অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে ওদের জন্য রান্নাবান্না করা, জল ফুটিয়ে দেওয়া এবং মায়ের মতো তাদের সেবা শুশ্রূষা করার ব্যবস্থা করলেন। এগারো নম্বর রেজিমেণ্টের নয় নম্বর কোম্পানীর সহকারী রাজনৈতিক শিক্ষক কমরেড লী জুয়েই-যু গুরুতর আহত হয়ে পড়েছিলেন—তিনি তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন যাতে নিজেই তাঁর সেবা যত্ন ব্যক্তিগতভাবে করতে পারেন। আমাদের ওষুধপত্র নিতান্তই কম রয়েছে দেখে তিনি তাঁর বড়ো ছেলেকে পাঠিয়ে জঙ্গল থেকে ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করিয়ে আনলেন। তারপর নিজেই সেগুলো শিল-নোড়ায় বেঁটে নিয়ে মণ্ডের মতো করে লীর আঘাতের জায়গাতে লেপে দিলেন, তিনদিন পর পর সেগুলো পালটে দিলেন। দেখা গেল ক'দিনের মধ্যেই লী উঠে দাঁড়াতে ও চলাফেরা করতে পারছেন।

রাজনৈতিক শিক্ষক লী ঐ বৃদ্ধাকে মা বলে ডাকতেন। বৃদ্ধা তাঁর নিজের

বুকে হাত রেখে সেই হাত এনে লীর বুকে বুলিয়ে দিতেন। দুজনের মুখেই তখন হাসি ফুটে উঠতো— আর এভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন রচিত হয়ে যেত।

জুনের শেষে আমাদের তিব্বতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পোপা গ্রাম ছেড়ে আমরা লং মার্চ চালিয়ে গেলাম ১৯৩৬ সালের শরৎকালের মধ্যেই অসংখ্য পাহাড় পর্বত ও নদী নালা পার হয়ে আমরা চীনের বিপ্লবের পরম তীর্থ-ক্ষেত্র ইয়েনানে পৌঁছে গেলাম!

লাতসে-কো-এ লাল পতাকা

লেফটান্যান্ট-জেনারেল চ্যাং জেন-চু

১৯৩৫ এর জুন মাসে লালফৌজের প্রথম ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি জলাভূমিতে এসে নিজেদের সেনাদলকে একত্র করে দক্ষিণ কানসুর দিকে এগিয়ে চলেছিলো। সেপ্টেম্বরে লালফৌজের চতুর্থ রেজিমেণ্টকে লাতসেকো দখল করার ভার দেওয়া হলো। প্রধান আক্রমণকারী অভিযাত্রী দলটিতে ছিলো আমাদের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন—আমাদের কাছে তা ছিলো একটা বিরাট সম্মান ও উৎসাহের বিষয়। জনমানবশূন্য জলাভূমি দিয়ে আসার সময়ের নিষ্ক্রিয়তার ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই শত্রুকে আক্রমণের এই সুযোগ পেয়ে আমরা তখন বেজায় খুশি। তাছাড়া আমাদের একটা গোপন মনোবাসনা ছিলো প্রথম যুদ্ধটা আচ্ছা করে করতে পারলে চেয়ারম্যান মাওকে দেখতে পাবো।

জ্যোৎস্নালোকিত একটা রাতে আমরা মার্চ করে চলেছি। সৈনিকেরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিলো, নিজেদের জানা গান গুন গুন করে গাইতে গাইতে। মাঝে মাঝে আমি আর সহকারী ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। সকলের এক দাবী, সবাই প্রথম অভিযাত্রী দলটিতে থাকতে চায়।

ভেজা, অন্ধকারে ঢাকা একটা জংলা জায়গা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এসেছি তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। দু'পাশের পর্বতের চূড়ায় তখন কুয়াসার আস্তরণ, সমুদ্রের বুকে ভাসমান দ্বীপের মতো দেখাচ্ছিলো সেগুলোকে। ধীরে ধীরে কুয়াসা দূর হয়ে গেলো। একটা গিরিপথ পার হওয়ার মুখে আমরা দূরে ছায়া ছায়া কিছু লোকজনের চলাচল লক্ষ্য করলাম। একজন স্কাউট তাড়াতাড়ি করে ছুটে এসে জানালো শত্রুদের একটা ব্যাটালিয়ান আমাদের পথের ডানদিকে। প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এগিয়ে চলাকে বাধা দেওয়া। আমরা তখন তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে খবর দিয়ে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে শত্রুদের ঐ দলটিকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই সৈন্যরা নিঃশব্দে দু' দু'জন করে লাইন করে পথ ধরে এগোতে লাগলাম। কিছু পরেই দ্রুত গুলি গোলার আওয়াজ এবং হাতবোমা ফাটার শব্দ সারা অঞ্চলটাকে কাঁপিয়ে তুললো। প্রায় মিনিট পনরো পরেই

শত্রু সৈন্যরা, ভাগ্যক্রমে যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিলো তারা ক'জন ছাড়া, সকলে আমাদের হাতে হয় বন্দী, না হয় শেষ হয়ে গেলো। বহুসংখ্যক জলের বোতল, রাবারের জুতো, প্রচুর রেশন এবং হাতবোমা আমরা পেলাম; জলাভূমি দিয়ে আসার পর এসব জিনিসের আমাদের তখন খুবই দরকার—আমরা তাই ওগুলো বাজেয়াপ্ত করলাম।

ধৃত দু'জন বন্দীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ কালে লাতসেকো-এর প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলাম; ওরা তখন প্রাণের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তাদের কথাবর্তা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো, বারবার বিব্রতভাবে নিজেদের নাকমুখ ওরা ঘষতে লাগলো। অনেক করে আশ্বস্ত করে বলার পর ওরা বললো: "মহাশয়েরা, আমাদের প্রতি দয়া করুন! জোর করে আমাদের সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়েছিলো।"

আমরা হাসবো, না রাগ করবো বুঝতে পারছিলাম না। ওদের পাশে যে সৈনিকেরা ছিলো তাদের চলে যেতে বলে আমরা বন্দীদের বললাম: "বন্দীদের প্রতি লালফৌজ সবসময়ই ভালো ব্যবহার করে। তোমরা ঠিকঠিক কথাই বলো।"

বোঝা গেলো এতে ওরা একটু শান্ত হয়েছে। "আপনারা যে এতো তাড়াতাড়ি চলে আসবেন তা' আমরা ভাবতেই পারিনি—" টুপি-পরা একজন বন্দী বলে উঠলো।

অন্যজন বললো: "মাত্র গতকাল আমরা লাতসেকো থেকে এসেছি—আর আমাদের রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার আগেই আপনারা আমাদের শেষ করে দিয়েছেন।"

আমরা আরো খোঁজ খবর জানতে চাইলাম। শেষপর্যন্ত তারা বললো: "আপনারা বরং খানিকটা ঘুরে যান। লাতসেকো একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধের আড়ালে রয়েছে আর ওখানে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য স্তরে স্তরে প্রতিরক্ষাব্যূহ সাজিয়ে পথরোধ করে রয়েছে। আপনাদের যদি ডানাও থাকতো তবুও আপনারা উড়ে যেতে পারতেন না!"

একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো: "দুত্তোর! কেন যে এভাবে মরতে এসেছিলাম!"

আমরা হেসে উঠলাম। এই দু'জন সৈন্য তাদের কমাণ্ডারকে এভাবে পাঠানোর জন্য দোষ দিচ্ছে—কিন্তু ওরা তো জানেনা ওখানকার ওদের সঙ্গীদের পরদিনই একই-দুরবস্থা হতে চলেছে!

লাতসেকৌ সত্যিই ছিলো প্রাকৃতিক প্রতিরোধে ঘেরা। একটানা উঁচু পাহাড় সারি দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল দিগন্ত ছুঁয়ে। দুদিকে খাড়া, লম্বাকৃতি উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় গাছপালাহীন পাথরের স্তূপ, ছোটো কটা পাইন গাছ ও কাঁটার ঝোপ। পাহাড়ের নীচে ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে প্রমত্ত একটা পাহাড়ী নদী; পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য স্রোতোধারার জল এসে পড়ছে তাতে। নদীর জল প্রচণ্ড বেগে গর্জন করে পাহাড়ের গায়ের পাথর ও শিলাখণ্ডে এসে পড়ছে—আর তা থেকে ছিটকে জল উপরের দিকে অনেকদূর উঠছে। আমি একটা ছোটো ডালপাতা জলে ফেললাম, দেখতে দেখতে তা কোথায় যে ভেসে গেলো! পাহাড়ের গা ও নদীর মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ীপথ দক্ষিণ কানসুর মিনচাও-এর দিকে চলে গেছে। এই জটিল গিরিপথের মাথায় শত্রুরা প্রায় এক ডজন প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করেছে।

আমরা নদীর তীরে বেড়াচ্ছিলাম আর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার বললেন: "অবস্থাটা খুবই পরিষ্কার। ঘুরে যাওয়া খুব কঠিন কাজ হবে। মিনচাও পৌঁছতে হলে এই গিরিপথটি আমাদের দখল করতেই হবে।"

আমি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম। এই সময় রক্ষাব্যূহ থেকে শত্রুরা গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করলো। আমাদের আশে পাশের পাথরের গায় এসে গুলি পড়তে লাগলো। অতিরিক্ত আস্থার সঙ্গে শত্রুরা চেঁচাচ্ছিলো: "পালিয়ে যাও। যদি আগামী বছর পর্যন্তও আক্রমণ চালিয়ে যাও তবু লাতসেকৌ দিয়ে যেতে হচ্ছে না একথা ঠিক জেনো!"

আমাদের হাসি পাচ্ছিলো। তাতু আর সোনালি বালির মতো দুস্তর নদী পার হয়ে এসেছি আমরা, বরফে-ঢাকা বিশাল পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করে, জলা-ভূমিকে জয় করে এসেছি আর ওরা এই কথা বলছে! লালফৌজের অগ্রগতি রোধ করবে এমন সাধ্য কার?

আমাদের আক্রমণকে জোরদার করার জন্য রেজিমেন্ট থেকে আমাদের চারটি ট্রেঞ্চমর্টার পাঠিয়েছে; শুধুমাত্র আমাদের ট্রেঞ্চমর্টার কোম্পানীই সেগুলো ব্যবহার করতো। প্রথম ব্যাটালিয়ন দুটো ভারী মেশিন-গান আমাদের ধার দিয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের রয়েছে প্রায় এক ডজন হালকা মেশিনগান। বর্তমান অবস্থায় ওগুলোকে প্রথম শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবেই গণ্য করা চলে।

সৈনিকদের মনোবলও এখন চমৎকার বেড়ে গেছে। পুরোদমে প্রস্তুতি চালানো হলো—অনেকে বেয়নেটে ধার দিয়ে নিলেন, রাইফেলগুলো ঘসে মেজে নিলেন। অনেকে কোমরে হাত বোমা বেঁধে নিলেন, কেউ কেউ মেশিনগানের যন্ত্রাংশ ঠিক করে রাখলেন, পাথরের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মেশিনগানের চাকাগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন। সবাই মিলে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আসন্ন আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে নিলেন।

পদাতিক বাহিনীর প্রস্তুতির কাজ তদারক করে আমি গোলন্দাজ কোম্পানীর কাছে গেলাম। গুটির দাগওয়ালা কমাণ্ডার তখন গুলির মাপজোক ও হিসাব নিকাশ করছেন দেখলাম। তাঁর কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: প্রস্তুতি কেমন হলো, জায়গাটা খুবই কঠিন, কী বলেন?" "খুবই খারাপ জায়গা সন্দেহ নেই," তিনি বললেন, "কিন্তু ভাবনার কিছু নেই। তাতু নদী পেরোনোর সময় মাত্র তিনটি মেশিনগান নিয়ে আমরা শত্রুদের পুরো একটা ব্যাটালিয়নকেই জব্দ করে দিয়েছিলাম।"

সহকারী কোম্পানী কমাণ্ডার এবং অন্য ক'জন গোলাগুলো নিয়ে আসছিলেন। তিনি বললেন: "ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের পাকা গোলন্দাজরা লাতসাকৌ-এ ওদের ভালো করেই নিজেদের কেরামতি দেখিয়ে তবে ছাড়বেন।"

সকলেই নিশ্চয়তার হাসিতে ফেটে পড়লেন।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধ শুরু হলো। রাইফেলের আওয়াজ এবং গোলাগুলির শব্দ পর্বত শিখরকে প্রকম্পিত করে তুললো। মেশিনগানগুলো শত্রুর রক্ষা ব্যূহকে গুড়িয়ে দিতে লাগলো। শত্রুর গুলি ও বোমার বিস্ফোরণে ভ্রূক্ষেপ না করে চতুর্থ কোম্পানীর বীর সৈনিকেরা গিরিপথের ওপর আক্রমণ চালালেন। প্রাকৃতিক প্রতিরোধের আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে হাতবোমা ছুড়ে মারছিলো। শত্রুর টেসার বুলেট থেকে আগুনের হলকা ক্রুদ্ধ ড্রাগনের মতো আমাদের এগিয়ে চলার পথকে ঝলসে দিচ্ছিলো। সারা তল্লাট জুড়ে আগুনের হলকা ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো। গোলাগুলির আওয়াজ আর বিস্ফোরণের শব্দ মেঘ গর্জনের মতো আকাশ বাতাস ভরে তুলেছিলো।

আমাদের পর পর চারটা আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেলো। অনেক সৈন্য চির-

নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। শত্রুর আস্থা বেড়ে গেছে, তারাও একটানা গুলিবর্ষণ করে চলেছে।

আমাদের সহকারী ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ওয়েই ছিলেন এমনিতেই রগচটা লোক, তিনি সবকিছু ভুলে গিয়ে রেগে চীৎকার করে উঠলেন: "দূর ছাই! এই ক'টা শয়তান আমাদের আটকে দেবে ভেবেছে? আমি ষষ্ঠ কোম্পানীকে নিয়েই এগিয়ে যাবো।"

উঠেই এগিয়ে চললেন। আমি তাঁকে হাতে ধরে চেঁচিয়ে বললাম: "ওয়েই, করছোটা কী? তোমার চেয়ে মাথাতো আমারও কম খারাপ নয়। কিন্তু খালি গায়ের জোর আর সাহসের জোরেই এরকম একটা জায়গায় কাজ হবে না। মাথাটা একটু খাটাতেই হবে।"

আমরা তখন তখনই আমাদের সৈন্যদের ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। কোম্পানী অফিসার ও প্ল্যাটুন লীডারদের নিয়ে আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনায় বসলাম। নানা জনে নানা রকম প্রস্তাব দিলেন: "আরো বেশী গোলাগুলি নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করা হোক, ছোটো কিন্তু দক্ষ ও সমর্থ অভিযাত্রীদল পাঠানো হোক, পাহাড়ের কোণ বেয়ে সম্ভব হলে একটা দাঁড়ানোর জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করা হোক এবং নদী পার হয়ে শত্রুদের পেছন থেকে ঘিরে ধরার ব্যবস্থা করা হোক"—ইত্যাদি নানা প্রস্তাব এলো।

সহকারী ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার ভার দিয়ে আমি রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে গেলাম।

বাহিনীর সেনাপতিদের পক্ষ থেকে উৎসাহ ও নির্দেশাদি দেওয়ার পর রেজিমেণ্ট কমাণ্ডার কমরেড ওয়াং কাই-শিয়াং এবং পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড ইয়াং চেং-যু বললেন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার নদী পার হয়ে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ডান দিক দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করবেন। ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠিত করে আক্রমণের জন্য তৈরী হওয়ার নির্দেশ তাঁরা দিলেন।

ফিরে এসে ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন এর মাঝে আমার অনুপস্থিতিতে আরো তিনবার অভিযান চালানো হয়েছে কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। আমি তাঁকে আক্রমণ বন্ধ করতে এবং সৈন্যদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে একটা অভিযাত্রী দল গঠনের জন্য বলে দিলাম।

পাইন গাছের একটা ঝোপের নীচে আমাদের সৈন্যদের জড়ো করা হলো। লাতসেকৌ থেকে তখনও মাঝে মধ্যে গুলির শব্দ ভেসে আসছে, মাথার ওপর দিয়ে দু' একটা গোলাগুলি উড়ে যাচ্ছে, গুলি-গোলা লেগে পাথরের টুকরো ভেঙ্গে আমাদের ওপর পড়ছে। মিলিত হওয়ার পর আগুনের আলোয় দেখা গেলো সৈন্যদের অবস্থা: অনেকের মুখ কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়, অনেকের কাপড় জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কারো কারো সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সকলের দৃষ্টিই কিন্তু লাতসেকৌ এর দিকে!

একটু আগে গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দুজন সৈনিকের কথা কানে এসেছিলো। "লাতসেকৌ দখল করতে না পারলে চেয়ারম্যান মাওকে মুখ দেখানো যাবে না।"—একজন বললেন। অন্যজন বললেন: "থামো তো ভাই! তুমি কি কখনো দেখেছো যে লালফৌজ কোনো জায়গা দখল করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে?"

পরিস্থিতি নিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য কোম্পানীর অফিসারদের ডাকা হলো এবং তাঁদের রেজিমেন্টের নির্দেশগুলো জানিয়ে দেওয়া হলো। আমি তাঁদের বললাম প্রথম ব্যাটালিয়ন নদী পার হয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে যাতে আমাদের সামনাসামনি আক্রমণের সঙ্গে তাল রেখে ওরা শত্রুর পেছন থেকেও আক্রমণ চালাতে পারে। আমাদের একটি আক্রমণ চালাবার মতো অভিযাত্রী দল গড়তে হবে।

বললাম: "আমরা যদি লতাসেকৌ দখল করতে না পারি তাহলে আমাদের পক্ষে উত্তর শেনসিতে পৌঁছা সম্ভব হবে না। বরফে-ঢাকা বিরাট পর্বতশ্রেণী এবং জলাভূমি পেরিয়ে আসার সময় আমরা যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছি এখনও সেই দৃঢ়তারই পরিচয় দিতে হবে। চেয়ারম্যান মাও, পার্টি ও সরকারের নেতারা আমাদের জয়ের খবরের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। সূর্য্য ওঠার আগেই লাত-সেকৌ-এ লাল পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে আমাদের।"

সারা তল্লাট আমাদের সৈনিকদের প্রত্যয়দৃঢ় চীৎকারে ভরে উঠলো। "আমি একজন কমিউনিস্ট, অভিযাত্রী দলে আমাকে নিন।" "আমার নাম লিখুন! আমি যুব লীগের লোক! আমার নামও লিখুন!'—এ রকম উৎসাহভরা আবেদন আসতেই লাগলো। নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন কি আহত ব্যক্তিরাও যোগদানের দাবী জানাতে লাগলেন।

যারা নাম তালিকায় ঢোকাতে পারলেন না তারা ক্ষোভে পা ছুড়তে লাগলেন। তবু অনেক নাম এসে গেলো। এর মাঝ থেকে চল্লিশটি নাম বাছাই করে দশ জন করে চারটি দল করতে হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে ডজন খানেক হাতবোমা,লাল কাপড় মোড়া হাতলের একখানি করে বড়ো তলোয়ার আর একটা করে পিস্তল থাকবে।

সব কিছু তৈরী। অভিযাত্রী দলটি একটা নালার মধ্যে লুকিয়ে প্রথম ব্যাটা-লিয়নের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ট্রেসার বুলেটের আগুনের ঝলকায় ওদের প্রতিজ্ঞা-কঠোর মুখগুলো দেখা যাচ্ছিলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যেন তাঁরা এই মুহূর্তে লাফিয়ে লাতসেকৌ দখল করলে পরই তবে শান্তি পাবেন।

মধ্যরাত্রের পর প্রায় দুটো নাগাদ আমাদের সামনে ডান দিকে একটা লাল অগ্নিশিখা অন্ধকার আকোশে উঠছে দেখা গেল। একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র বিউগলের শব্দও ভেসে এলো। আমাদের ট্রেঞ্চমর্টার ও মেসিনগানগুলো তখনই শত্রুর আক্রমণ স্থলগুলোকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অভিযাত্রী জঙ্গী দলটি নালা থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ শুরু করলো। একটু ঝুঁকে নালার কাছে দাড়িয়ে বিস্ফোরণের আগুনের আলোয় তাদের প্রত্যেকের গতিবিধি আমি লক্ষ্য করছিলাম। ষষ্ঠ কোম্পানীর কমাণ্ডার এবং আরো চার পাঁচ জন তো দেখলাম মাথা নুইয়ে একেবারে পাহাড়ের গা ঘেসে এগিয়ে চলেছেন, তাদের পেছনে দেখলাম আরেকটা দল যেন চলতে চলতে ছড়িয়ে পড়ছেন। মুখে চোখে তাদের কঠোর প্রতিজ্ঞা আঁকা। কখনো হামা গুড়ি দিয়ে কখনও পথের বাধ কাটিয়ে লাফ দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন, তাদের তলোয়ারের হাতলে মোড়া লাল কাপড় আগুনের ঝলকে উড়ছে দেখা যাচ্ছিলো। মুখে গুটির দাগওয়ালা গোলন্দাজ কোম্পানীর কমাণ্ডার তার মেসিনগানের গোলা ছুড়তে ছুড়তেই অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলছেন যেন তারা শুনতে পাচ্ছেন: "কমরেডগণ। চালিয়ে যান, আমি আপনাদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি। বেটাদের আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিন।"

আমাদের এই আচমকা আক্রমণে বেতাল হয়ে শত্রুরা তাদের রক্ষাব্যূহের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হাতবোমা ছুড়ে মারতে লাগলো। সারা পথ বোমার টুকরো গোলাগুলিতে আর অকেজো বোমায় ভরে উঠতে লাগলো! একটি মেসিনগান থামলো তো অন্যটা গর্জে উঠতে লাগলো।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলটি খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে তখন। প্ল্যাটুন লীডার চেন ফুয়ো-হো আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগভরে আক্রমণটা লক্ষ্য করছিলেন, আর মাঝে মাঝেই পা ছুড়ছিলেন। আমি তাঁকে যেতে দেবো না, কারণ জানতাম এতে আরো একজন আহতের সংখ্যাই বাড়বে। কিছুক্ষণ পরে আর সহ্য করতে না পেরে আমার দিকে ঝুঁকে আগ্রহ, ক্রোধ আর উত্তেজনায় ভয়া কাঁপা গলায় বললেন: "ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, দয়া করে আমাকে যেতে দিন…আমি নিশ্চিত, কাজটা আমি করতে পারবোই!"

তরুণ ত্রই কমরেডের আগ্রহ আমার জানা ছিল। আনহুয়েই-এর অধিবাসী এই কমরেডটির ছিলো অদম্য প্রাণশক্তি; বাস্কেট বল খেলার সময়ই হোক বা লড়ায়ের মাঠেই হোক সর্বত্র তার এই উদ্যম আমি লক্ষ্য করেছি। অভিযাত্রী দলে নাম লেখাবার সময়ই তিনি চীৎকার করে বলেছিলেন: "কিছুতেই ভয় পাওয়ার লোক আমি নই! যদি তলোয়ার দিয়ে গড়া পাহাড় বেয়েও উঠতে হয় তবু আমরা তা জয় করে ছাড়বো! লাতসেকৌ হচ্ছে সর্বশেষ গিরিপথ আর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করার জন্য যদি জান কবুল করতে হয় তাও ভী আচ্ছা!"

এই যুবকটির দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে আমি তাকে যেতে দিতে প্রায় রাজী হয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু একটু ভেবে থেমে গেলাম! এখনও তার সময় আসে নি। কিছুক্ষণ পরে সময় হয়েছে বুঝলাম; মেশিনগান চালকদের গোলাগুলি বাড়িয়ে দিতে বললাম যাতে তৃতীয় দলটি কাজ শুরু করে দিতে পারেন। এদিকে তৃতীয় দলকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। আমার মুখ থেকে কথা বের হয়েছে কি হয়নি, দেখলাম চেন ফুয়ো হো তাঁর বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে চলে গেছেন অনেকখানি আর তাঁর পেছনেই দলের অন্য লোকেরা। শুনলাম তাঁরা চীৎকার করে বলছেন: "আক্রমণ চালিয়ে যান কমরেডরা! লাতসেকৌ দখল করে নিন. তারপরই চেয়ারম্যান মাওকে দেখতে পাবো আমরা! দেখা যাক কারা আগে লাতসেকৌ পৌছোয়—আমরা, না প্রথম ব্যালিয়নের কমরেডরা!"

পঞ্চমবারের মতো অভিযান শুরু হলো। অভিযাত্রী দলের কমরেডরা তাঁদের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা নিয়ে সফলভাবেই শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। একজন পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন লাফিয়ে এসে দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন। আহতরাও এগিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের ক্ষত স্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছে নেবার সময় পর্যন্ত তাঁদের ছিল না।

এদিকে প্রথম ব্যাটালিয়নের কাছ থেকে কেনো জানি না কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমি খুবই চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম এমন সময়ে শত্রুর পেছন থেকে প্রথম ব্যাটালিয়নের বিউগলের চেনা সুর ভেসে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাতবোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। চারদিক থেকে প্রচণ্ড আনন্দধ্বনি জেগে উঠলো: "প্রথম ব্যাটালিয়নের কমরেডরা এসে গেছেন! এগিয়ে চলুন, কমরেডগণ!"

তলোয়ার উঁচিয়ে আমাদের অভিযাত্রী দলগুলোর কমরেডরা প্রাণপণে অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। সিগন্যাল স্কোয়াডের "ক্ষুদে কমরেডটি" এতক্ষণ আমার কাছে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলো, সে আমার আদেশের অপেক্ষা না করেই ধনু-থেকে-ছুটে-যাওয়া তীরের মতো ছুটে গেল। আমাদের রণধ্বনি, বিউগলের আওয়াজ, গোলাগুলির শব্দ সারা অঞ্চলে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করলো। আগুনে আর ধোঁয়ায় সারা তল্লাট ভরে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় কোম্পানীর শক্তিশালী সমর্থন পুষ্ট হয়ে আমাদের অভিযাত্রী দলগুলো পাহাড় বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

এই চাপের মধ্যে পড়ে শত্রুপক্ষ একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং হতবুদ্ধি হয়ে রণে ভঙ্গ দিলো। ক'জন পাহাড় বেয়ে পালাতে চেষ্টা করলো, কজন পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল, অন্যরা দ্বিতীয় গিরিপথের দিকে ছুটে গেল। পর পর অনেকগুলো হাতবোমা ছুড়ে আর তাদের বড়ো তলোয়ারগুলো ব্যবহার করে রক্ষাব্যূহের শত্রুসৈন্যের অবশিষ্টদের শেষ করে দিলেন আমাদের কমরেডরা। তারপর তাঁরা এগিয়ে চললেন দ্বিতীয় গিরিপথের দিকে।

দিনের আলো ফুটে উঠতেই আমরা লাতসেকৌ গিরিপথ দখল করে নিলাম।

লড়াই তখনো শেষ হয়নি। পঞ্চম কোম্পানী তখন তখনই প্রথম ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডানদিকের দ্বিতীয় গিরিপথের রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো। ঐ সময়েই আমাদের বহু সংখ্যক সৈন্য পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন তখন। হাতাপু-র দিকে এগিয়ে চলা পথে ও সমতলের সর্বত্র অজস্র লাল পতাকা উড়ছে আর সেই পতাকাতলে আমাদের সাহসী বীরেরা শত্রুকে তাড়া করে এগিয়ে চলেছেন তখন।

চিরউড্ডীন লাল নিশান

মেজর তাম চিং-লিন

১৯৩৬ এর মে মাসে লালফৌজের একটা দল সিকাং-এর তানপা থেকে কানস্থর শানতান প্রদেশের সেচুয়ানের মধ্য দিয়ে ছ'মাসে প্রায় তিন হাজার লী (প্রায় একহাজার মাইল) পাড়ি দিয়ে এলো। দীর্ঘ আর দুরূহ এই অভিযান কালে আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শের এবং আমাদের সংগ্রামী প্রেরণার প্রতীক লালপতাকা আমাদের সৈন্যদলের যাত্রাপথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পতপত করে উড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেক কোম্পানীরই একটি করে লালপতাকা থাকতো। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর দুর্গম পথচলার সময় এই পতাকাই আমাদের বিজয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে খাড়াই পাহাড় পর্বত আর দুস্তর বেগবতী নদী পার হয়ে আসতে, আমাদের স্তব্ধ করে দেওয়ার শত্রুর সকল চেষ্টাকে তা গুড়িয়ে দিতে আমাদের প্রেরণা দিয়ে এসেছে।

শত্রুরা তাই লাল পতাকা দেখলেই ঘৃণায় ফেটে পড়তো।

আমরা যখন শানতানে এসে পৌছেছি শত্রুরা তখন সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিলো, তারা ভাবছিলো আমরা যেহেতু ভীষণ ক্লান্ত তাই এই হচ্ছে আমাদের শেষ করে ফেলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আমাদের অগ্রগতির ফলে জনগণের মনে যে বিপুল প্রেরণা জেগেছে তাকেও তারা দূর করে দিতে পারবে ভেবেছিলো।

শহরে এসে পৌছার পর তৃতীয় দিনেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একানব্বই নম্বর ডিভিশনের ২৬৮ নম্বর রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের আমাদের ওপর ভার দেওয়া হলো উত্তর দিকের ফটকের বাইরে শিহলিপুতে একটা রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার জন্য। ওখানে আমরা পৌছার আগেই মাইল খানেকের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিলো। তারা তখন পুরোদমে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। শিহলিপুর পশ্চিমদিকে পঞ্চম কোম্পানী অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। আমরা যখন শত্রুদের আচ্ছা করে আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছি আমাদের কমাণ্ডার সামানা

কিছু দূরে ঠিক আমাদের সামনেই গ্রামের সবচেয়ে উঁচু ছাদের সমান একটা বালুর পাহাড়ের ঢিবি দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হলো শত্রু যদি ঐ উঁচু জায়গাটা দখল করে নেয় তবে ওখান থেকে গোলাগুলি ছুড়ে আমাদের সহজেই জব্দ করে রাখতে পারবে। তিনি ডেপুটি কমাণ্ডারকে আদেশ দিলেন প্রথম প্ল্যাটুনকে নিয়ে ঐটি দখল করে নেওয়ার এবং তার ওপর একটি লালপতাকা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। "ঐ জায়গাটা দখলে রাখুন! লাল পতাকাখানি যাতে উড়তে থাকে তার ব্যবস্থা করুন!" এই ছিলো তাঁর সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার নির্দেশ

আমি ছিলাম পতাকাবাহী। আদেশ পাওয়া মাত্র আমি একখানি লাল পতাকা নিয়ে ছুটলাম ডেপুটি কমাণ্ডারের সঙ্গে ঐ উঁচু জায়গার দিকে। প্রায় কুড়ি কদম দূরে রয়েছি, শত্রুপক্ষের তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য তাদের তলোয়ার উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। তারা এক ঝটকায় নেমে আসতে আসতে আমাদের আক্রমণ করলো। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে শেষ জায়গাটুকু এক দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। এই সময়েই ডেপুটি কমাণ্ডার গুলি করার আদেশ দিলেন। দুম্‌দাম করে গুলি ছোড়া শুরু হলো। দু'জন শত্রু সৈন্য গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। তৃতীয় সৈন্যটির তখন এক কাহিল অবস্থা সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছে কিন্তু তার পা পাদানিতে আটকে গেছে আর ঘোড়াটি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমি ততক্ষণে পাহাড়টির ওপর লাল পতাকাখানি উড়িয়ে দিয়েছি।

শত্রুর পুরো বাহিনীটি গলা ছেড়ে চীৎকার করতে করতে ডানে বায়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে আমাদের ওপর এসে পড়লো। ডেপুটি কমাণ্ডারের নির্দেশে আমরা ঠাণ্ডা মাথায় গুলি বর্ষণ করে চললাম, শত্রু একদম কাছে এসে পড়লে তখন বেয়নেট চালাচ্ছিলাম। আমাদের অন্য একটি দল শত্রুদের তাড়া করে নিচ্ছিলো। দ্বিতীয়বারের আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে এবং লাল পতাকা লালফৌজের মনোবলের দিক থেকে কী অসাধারণ প্রেরণাদায়ক ও তাদের নিজেদের পক্ষে কী সাংঘাতিক হানিকর তা উপলব্ধি করে শত্রুরা জন বারো লোক জড়ো করে লাল পতাকাখানির দিকে ছুটে এলো এবং আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো। মাথার ওপর দিয়ে পাশ দিয়ে গুলি ছুটছে; একটা গুলি এসে পতাকা দণ্ডটিতে লাগলো—কিন্তু তবু তা ভাঙলো না। বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়েও ভাবছিলাম শুধু একটি কথাই: "যতক্ষণ প্রাণ আছে লালপতাকা খানিকে

পড়ে যেতে দেবো না। এর চেয়ে বহু কঠিন লড়াই চালিয়ে এসেছি আমরা, আমাদের কোম্পানীর কতোজন পতাকাবাহীকে যে প্রাণবলি দিতে হয়েছে তার ঠিক নেই লাক পতাকাকে কিন্তু মাটিতে লুটিতে পড়তে কেউ দেয়নি। প্রাণ দিয়ে হলেও পতাকাকে উচ্চে তুলে রাখবোই আমি।"

উড়ন্ত পতাকাখানি শত্রুদের যেন ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো। ঘোড়া চালিয়ে আর তলোয়ার ঘুরিয়ে এগিয়ে এসে একজন শত্রু সৈন্য আমাকে সরাসরি আক্রমণ করলো। সাত আট গজ দূর থেকে তলোয়ার তুলে সে আমাকে কেটে ফেলতে তলোয়ার উঠিয়েছে দেখতে পেলাম। আমার শেষ হাতবোমাটি তার দিকে ছুড়ে মারতে যাচ্ছি এমন সময় লম্বা মতো একজন কমরেড এসে তাঁর বেয়নেট সোজা ওর গায়ে বিঁধিয়ে দিলেন। চীৎকার করে সে ঘোড়ার উপর থেকে লুটিয়ে পড়লো। "ঐ দেখুন" বলে চীৎকার করতে যাবো এমন সময় শত্রুপক্ষের একখানি তলোয়ার আমার ডানদিকে ঝলসে উঠলো—একটি আঘাতেই পতাকা দণ্ডটি টুকরো হয়ে গেলো বিন্দুমাত্র সংশয় না করে আমি পতাকা দণ্ডের উপর দিকটি আকড়ে ধরলাম আর ঠিক তখনই মনে হলো কে যেনো একটা বিরাট হাতুড়ী দিয়ে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করলো। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম এবং মাটিতে পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলো। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রামের যেখানে আমাদের সৈন্যরা রয়েছে তার সামনে পূর্বদিকে প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেলো। শত্রুরা তখন পাহাড়ের উঁচু ঢিবি থেকে সরে গেছে। কোনো অনুভূতির শক্তি ছিলো না—শুধু ডানদিকে প্রচণ্ড একটা বেদনাবোধ করছিলাম। মাটি রক্তে ভিজে যাচ্ছিলো। আমার কর্তব্যের কথা মনে পড়লো! লাল পতাকাখানিকে সমুন্নত আমাকে রাখতেই হবে যে! কুয়োমিনটাং দস্যুরা জেনে রাখুক যে লাল পতাকাকে ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করে দাঁতে দাঁত চেপে আমি লাল পতাকা খানিকে উচ্চে তুলে ধরলাম। অত্যন্ত মৃদুস্বরে আমার নাম ধরে কে ডাকছেন শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি একটু দূরেই ডেপুটি কমাণ্ডার এককুণ্ড রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "কেমন আছো?"

আমি বললাম: "ডেপুটি কমাণ্ডার, আমার তেমন কিছুই হয় নি।"

লাল পতাকাখানি উড়ছে দেখে ডেপুটি কমাণ্ডার খানিকক্ষণ ভাবলেন।

হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনা আসায় তাঁর চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তিনি আশে পাশের আহত কমরেডদের বললেন : "কমরেডগণ ! দেখছেন না.. আমাদের লাল পতাকা পড়ে.. যায় নি...ঐ লাল পতাকার মতো সমুন্নত থেকে আমাদেরকেও শেষ গুলিটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শত্রুকে পেছনে থেকে আক্রমণ করতেই হবে!"

ডেপুটি কমাণ্ডারের কথায় আহত কমরেডরা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন এবং শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করলেন।

পেছন থেকে আকস্মিক এই গুলির শব্দে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যরা পেছনে ফিরে লাল পতাকাখানা উড়ছে দেখে একেবারে থ বনে গেলো। তারা ভাবলো চারদিক থেকে তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে। তারা ঘোড়া ফিরিয়ে চম্পট দিতে লাগলো।

আমাদের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার পাহাড়ের ওপর লাল পতাকা উড়ছে দেখে এবং শত্রু পক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যরা প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে চতুর্থ কোম্পানীকে বললেন: "কমরেডগণ! উঠে দাঁড়ান, শত্রুকে জোর আক্রমণ শুরু করুন!"

বিউগল বেজে উঠলো আর আমাদের সৈন্যরা পলায়নপর শত্রুদের আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে চললেন!

আমাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। দিশেহারা হয়ে পালাতে গিয়ে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ছিটকে পড়ছিলো। এভাবেই ওদের অনেকে জখম হয়ে গেলো।

অনেক দূর গিয়ে ওরা বুঝতে পারলো যে ওরা প্রতারিত হয়েছে। প্রচণ্ড রাগে ওরা আমাদের দিকে ছুটে এলো তলোয়ার উঁচিয়ে। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেও আমাদের আহত কমরেডরা রাইফেল শক্ত হাতে তুলে ধরে, হাত-বোমা নিয়ে শত্রুদের আক্রমণের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। যারা উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না তারা শত্রু সৈন্যের ঘোড়াগুলোর পায়ে সর্বশক্তি নিয়ে আকড়ে ধরতে লাগলেন। বা হাতে পতাকা দণ্ডটি ধরে ডান হাতে হাতবোমার সেফটি-পিনটি সরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসা একজন শত্রু সৈন্যকে লক্ষ্য করে তা ছুড়ে মারলাম। বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে চলা ঘোড়াগুলোর শব্দ, লোকজনের চীৎকার, ধোঁয়ায় আর গুলি গোলার আওয়াজে চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠছে।

আমি দেখলাম একজন শত্রু সৈন্য সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাঁর অসির ঝলকানি দেখতে পেলাম তারপর আর কিছুই মনে নেই।

যখন জেগে উঠলাম সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হয় হয়। গুলিগোলা বা ঘোড়ার ক্ষুরের কোনা শব্দ শুনতে পেলাম না। দেখলাম একজন চিকিৎসা বিভাগের কমরেড আমার ক্ষতগুলো বেঁধে দিচ্ছিলেন। রাজনৈতিক শিক্ষক ও অন্যান্য কমরেডরা আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। আনন্দে ও উত্তেজনায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : "কমরেড···লাল পতাকাখানি কোথায় ?"

আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটর আমার দিকে ঝুঁকে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে বললেন, "কমরেড তান"···কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো "ঐ দেখো তা উড়ছে!" তিনি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অনেক কষ্টে বেদনাজর্জর শরীরটা একটু তোলার চেষ্টা করে তাঁর নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই উঁচু টিবির ওপর লাল পতাকাখানি উড়ছে; অন্য একজন নূতন পতাকাবাহী তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিপাতে সেই চির-অম্লান, উজ্জ্বল লাল পতাকাখানি লালফৌজের সকল শৌর্য ও বীরত্বের প্রতীক হয়ে তখন হাওয়ায় উড়েই চলেছে!